প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৬ ❖ ১০ ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সংখ্যা

মা দিবস

করোনা ভয় আমরা অচিরেই করবো জয়

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	..... ৩০০ টাকা
ভারত	..... ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	..... ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	..... ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ১৬
■■■■■ ১০ - ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ২৭ বৈশাখ - ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মায়ের প্রতি যথার্থ ভালবাসা ও যত্ন প্রকাশিত হোক

'মা' মানব জীবনের সবচেয়ে বেশি আবেগিক শব্দ ও সম্পর্ক। স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীর মধুরতম সম্পর্কটাও হবার কথা মা-সন্তানের সম্পর্ক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্যিই তাই। বিশেষভাবে মায়ের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও সেরা সম্পদ হলো তার সন্তান। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা তার জীবনটাই দিয়ে দেয় তিলে তিলে। শুধু একবার নয় প্রতিদিনই মা সন্তানকে জীবন দিয়ে থাকে। সন্তানের প্রতি মায়ের এই ত্যাগ ও ভালবাসার প্রতিদান সন্তান কোনভাবেই দিতে পারবে না। কিন্তু মার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারে সর্বদা এবং তা করার মধ্য দিয়েই মার প্রতি সন্তানের ভালবাসার একটি প্রকাশ ঘটে।

মে মাস আমাদের জন্য সে সুযোগটা নিয়ে আসে। কাথলিকদের জন্য মে মাস, মা মারীয়ার মাস। মারীয়ার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর পুত্র এ জগতে আসলেন। মাতৃত্বকে ধন্য করলেন। মহিমান্বিত করলেন মা ও সন্তানের সম্পর্ককে। মা মারীয়াকে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টানগণ মা'দেরই শ্রদ্ধা-সম্মান জানায়। মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে বিশ্বের সব মানুষ যাতে এক সঙ্গে মাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে পারে সেজন্য প্রতিবছর মে মাসের ২য় রবিবার 'মা দিবস' পালিত হয়। পরিবার ও সমাজে মা ও মাতৃত্বকে স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শন করাই এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য। তবে সে উদ্দেশ্যটা সব সন্তানদের সব সময়েই মনে থাকুক এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুক। মায়েরা যেমনি সর্বদা তাদের সন্তানদের ভালো চায় তেমনি সন্তানদেরও চাওয়া হোক মা'দের ভালো রাখা। মা'দের ভালো রাখা তো সন্তানদের পবিত্র দায়িত্বও বটে। কুমারী মারীয়ার প্রতি আমাদের কাথলিকদের যে ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালবাসা সেরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যেন আমাদের মায়েদের জন্যও থাকে। কোন অবস্থাতেই আমরা যেন মাকে অবহেলা না করি। জীবনে দারিদ্র বা কঠিনতা আসতে পারে কিন্তু মাকে ভালবাসতে, তার পাশে থাকতে যেন দরিদ্র ও কঠিন না হই। বিশেষভাবে মা যখন প্রবীণ বয়সে পৌঁছায় তখন তার পাশে থাকা, তার খোঁজ-খবর নেওয়ার অর্থই হলো মার যত্ন নেওয়া। সন্তানকে মানুষ করার মধ্য দিয়ে মা যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন তেমিন মায়ের যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়েও সন্তান ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে। যিশু তাঁর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে মায়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও যত্নের বিশেষ নজির দেখিয়েছেন মাকে তাঁর প্রিয় শিষ্য যোহনকে দান করার মাধ্যমে। যিশু ও তাঁর শিষ্যদের জীবনে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের সময় মা মারীয়া সর্বদা পাশে ছিলেন।

আমাদের মায়েরা যারা জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনের হাল ধরে রেখেছেন তারা কুমারী মারীয়ার জীবন দেখে আশান্বিত হতে পারেন। কেননা মা মারীয়া তাদেরর মতই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবার দেখভাল করেছেন। অনেকে অভিযোগ করেন, আমাদের কিছু কিছু পরিবারে মায়েরা যথার্থ মর্যাদা ও যত্ন পায় না ছেলের বউদের কারণে। সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও কথাটা ফেলে দেবার নয়। একইভাবে স্বামীর অনিচ্ছার কারণে মেয়েও হয়তো তার মার যথার্থ যত্ন করতে পারে না। তাই সকল সন্তানকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা সম্ভবপর সকল উপায়ে পিতামাতার যত্ন নিবে ও ভালবাসবে। এক্ষেত্রে আমাদের ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টানসমাজের কিছু শব্দ (মা, কাকীমা, জেঠিমা, পিসীমা, মাসীমা, বৌমা, শাশুড়ীমা) আমাদের 'মা বোধ' আরো বেশি বিস্তৃত করুক এবং মা'দের প্রতি যত্ন ও সেবাদানে আরো নিবিষ্ট করুক। একই সাথে আমরা সকলে স্মরণ করি আমরা সবাই প্রকৃতির সন্তান। তাই এই প্রকৃতি মায়েরও বিশেষ যত্ন নিবো। মা'কে যেমনি কষ্ট দিতে চাই না ঠিক তেমনি প্রকৃতিকেও বিনষ্ট বা ধ্বংস করবো না।

প্রকৃতি মা, নিজের মা এবং বিশ্বের সকল মায়েদের যত্ন নিবো ও ভালবাসবো। স্বর্গীয় মা কুমারী মারীয়া জগতের সকল মাকে আশির্বাদ করুক। সব বেদনা সওয়া মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাতে আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই। ✝

মঙ্গলবাণী

"যে মেষগুলো আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি : তাদের বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকে কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না।" *(যোহন ১০ : ২৭-২৮)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১০ - ১৬ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১০ মে, রবিবার
শিষ্যচরিত ৬: ১-৭, সাম ৩৩: ১-৫, ১৮-১৯, ১ পিতর ২: ৪-৯, যোহন ১৪: ১-১২

১১ মে সোমবার
শিষ্যচরিত ১৪: ৫-১৮, সাম ১১৫: ১-৪, ১৫-১৬, যোহন ১৪: ২১-২৬

১২ মে, মঙ্গলবার
সাধু নেরেয়ুস ও আখিলেয়ুস, সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
সাধু পানক্রাস, সাক্ষ্যমর, সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
শিষ্যচরিত ১৪: ১৯-২৮, সাম ১৪৫: ১০-১৩, ২১, যোহন ১৪: ২৭-৩১

১৩ মে, বুধবার
ফাতিমা রাণী মারীয়া, স্মরণ দিবস
শিষ্যচরিত ১৫: ১-৬, সাম ১২২: ১-৫, যোহন ১৫: ১-৮

১৪ মে, ব"হস্পতিবার
সাধু মাথিয়াস, প্রেরিতদূত, পর্ব
শিষ্যচরিত ১: ১৫-১৭, ২০-২৬, সাম ১১৩: ১-৮, যোহন ১৫: ৯-১৭

১৫ মে, শুক্রবার
শিষ্যচরিত ১৫: ২২-৩১, সাম ৫৭: ৭-১১, যোহন ১৫: ১২-১৭

১৬ মে, শনিবার
শিষ্যচরিত ১৬: ১-১০, সাম ১০০: ১-৩, ৫, যোহন ১৫: ১৮-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ মে, রবিবার
+ ২০০১ ফা. ফ"াস্সেসকো স্পাগনোলো, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সি. এমিলিয়া মিনজ, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফা. ফিলিপ ডি' রোজারিও (বরিশাল)

১২ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৩ ব্রা. ইসিদোর ফ্যাবিয়ুস জয়াল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ ব্রা. রালফ বার্ণার্ড বেইয়ার্ড, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৪ সি. মেরী গ্লোরিয়াম, পিসিপিএ

১৩ মে, বুধবার
+ ১৯৮৭ ব্রা. জেমস তারাভোরিক, সিএসসি (ঢাকা)

১৪ মে, ব"হস্পতিবার
+ ১৯৩৮ ফা. জাঁ হামন, সিএসসি
+ ২০০৪ সি. মিরিয়াম রিচার্ড, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৭ সি. মেরী সুশীলা, এসএমআরএ

১৫ মে, শুক্রবার
+ ১৯৩৮ ফা. সেলেষ্টিন এফ. নাইয়ার্ড, সিএসসি
+ ১৯৫৪ ফা. থেয়োডরো কাস্টেল্লি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৮ ফা. বেঞ্জামিন লাব্বে, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৬ মে, শনিবার
+ ১৯৮৯ সি. এম. ইডিথ, আরএনডিএম (ঢাকা)

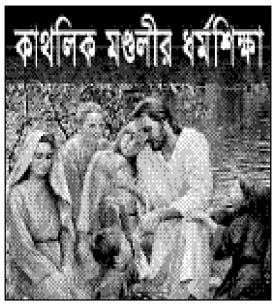

॥খ॥ আনুষ্ঠানিক উপাসনা কি ভাবে হয়?

কথা ও ক্রিয়াসমূহ

১১৪৫ সংস্কারীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে খ্রিস্ট ও পবিত্র আত্মার মধ্যে পিতার সঙ্গে তাঁর সন্তানদের মিলন, যে-মিলন কথা ও ক্রিয়ার মাধ্যমে সংলাপরূপে প্রকাশ পায়। অবশ্য প্রতীকী ক্রিয়াগুলো যদিও ভাষার মতই কাজ করে, তথাপি ঐশবাণী ও বিশ্বাসের সাড়া এই ক্রিয়াগুলোর সঙ্গী হয়ে এদেরকে প্রাণবন্ত করে, যাতে ঐশরাজ্যের বীজ উত্তম জমিতে ফসল উৎপাদন করতে পারে। ঐশবাণী যা ব্যক্ত করে তা-ই ঔপাসনিক ক্রিয়ারূপ চিহ্নে প্রকাশ পায়: ঈশ্বরের স্বাধীন উদ্যোগ এবং তাঁর জনগণের বিশ্বাসের সাড়া।

১১৫৪ ঐশবাণী ঘোষণা-অনুষ্ঠান হচ্ছে সংস্কারীয় অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বাসী ভক্তদের বিশ্বাস লালন করার জন্য এমন সব চিহ্নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে যা ঐশবাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ: বাণী-গ্রন্থ (বাণীবিতান বা সুসমাচার-গ্রন্থ), বাণী-গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন (শোভাযাত্রা, দূপারতি, মোমবাতি), বাণী-পাঠের স্থান (গ্রন্থাসন বা পাঠমঞ্চ), ঐশবাণীর সজোর ও বোধগম্য ঘোষণা, সেবাকর্মীর উপদেশ যা ঐশবাণী ঘোষণাকে অব্যাহত রাখে, এবং জনগণের প্রত্যুত্তর (ধুয়ো, ধ্যান-গীতি, স্তবগান এবং বিশ্বাস-স্বীকার)।

১১৫৫ ঔপাসনিক কথা ও ক্রিয়া অবিচ্ছেদ্য – চিহ্ন ও নির্দেশনারূপে যেমন, চিহ্নরূপে তাদের সফল কার্যকারিতার জন্য তেমনি। পবিত্র আত্মা যখন বিশ্বাস জাগ্রত করেন তখন তিনি যে শুধুমাত্র ঐশবাণী বুঝার শক্তি দেন তা নয়, বরং সংস্কারসমূহের মাধ্যমে, তিনি ঈশ্বরের "আশ্চর্য কার্যাবলীও" উপস্থিত করেন যা ঐশবাণীতে ঘোষণা করা হয়। পবিত্র আত্মা পিতার কার্যাবলী উপস্থিত করেন এবং জ্ঞাত করেন, যে কার্য তাঁর প্রিয় পুত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

গান ও সঙ্গীত

১১৫৬ "সার্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গীতের ঐতিহ্য হ'ল অপরিসীম মূল্যের সম্পদ যা অন্যান্য চারুকলার চেয়েও মূল্যবান। এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ হ'ল এই যে, কথা ও সুরের সমন্বয়ে পুণ্য সঙ্গীত হয়ে উঠে উপাসনা-অনুষ্ঠানের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।" প্রায়শঃ বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত সামসঙ্গীতগুলো প্রাক্তন সন্ধির উপাসনা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। খ্রিস্টমণ্ডলী এই ঐতিহ্যকে আবহমান রেখে বিকশিত করছে: "সবাই মিলে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও অধ্যাত্ম বন্দনা গান গেয়ে চল, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাদ্যের ঝংকারে প্রভুর স্তুতি গান কর", "যে গান করে সে দু'বার প্রার্থনা করে।

১১৫৭ গান ও সঙ্গীত, চিহ্নরূপে অধিকতর অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তখনই যখন তা "উপাসনা-অনুষ্ঠানের সঙ্গে... ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়।" এ ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান নীতি অনুসরণীয়: প্রার্থনার সুষমা প্রকাশ, নির্ধারিত সময়ে উপাসকমণ্ডলীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুষ্ঠানের ভাবগাম্ভীর্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ। এইভাবে গান ও সঙ্গীত, উপাসনার কথা ও ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা এবং ভক্তজনগণের পবিত্রতা সাধনে সহায়তা করে।

১১৫৮ চিহ্নগুলোর (গান, সঙ্গীত, কথা ও ক্রিয়া) ঐকতান প্রকাশ পায় ও ফলপ্রসূ হয় তখনই যখন অনুষ্ঠানকারী ঐশজনগণের সাংস্কৃতিক সম্পদের মধ্যে তা ব্যক্ত হয়। সুতরাং খ্রিস্টমণ্ডলীর নিয়মাবলীর সঙ্গে মিল রেখে, "ভক্তগণ কর্তৃক গীত ধর্মীয় সঙ্গীতের ব্যবহার আরও সূক্ষ্মভাবে উন্নতি সাধন করতে হবে, যাতে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান, পুণ্য ক্রিয়াদিতে এবং উপাসনা-অনুষ্ঠানে "বিশ্বাসী জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা যায়"। ...কাথলিক ধর্মতত্ত্বের সাথে গানের কথাগুলোর অবশ্যই মিল থাকতে হবে। বস্তুতঃ ধর্মসঙ্গীতের প্রেরণার মূলে থাকবে: পবিত্র শাস্ত্র ও আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক উৎসবসমূহ। ❑

ফাদার সনি রড্রিক্স

পুনরুত্থানকালের পঞ্চম রবিবার

প্রথম শাস্ত্র-পাঠ ঃ শিষ্যচরিত ৬ঃ১-৭
দ্বিতীয় শাস্ত্র-পাঠ ঃ ১ পিতর ২ঃ৪-৯
মঙ্গলসমাচার ঃ যোহন ১৪ঃ ১-১২

মুলভাব : আমিই পথ, সত্য ও জীবন।।

অজ্ঞাত এক গ্রামে তাঁর জন্ম, গ্রামীণ এক মহিলার শিশু তিনি। বেড়ে উঠেছেন অন্য এক গায়ে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছুঁতোরের কাজ করে। অতঃপর তিন বছর ধরে ছিলেন ভ্রাম্যমান প্রচারক। তথাপি কোন বই লিখেননি তিনি। ছিল না তাঁর কোন পদমর্যাদা, ছিল না তাঁর কোন পরিবার কিংবা গৃহ। কলেজে পড়েননি তিনি, কোন বৃহৎ নগরীতে ছিল না তাঁর পর্দাপন। জন্ম স্থান থেকে ২০০ মাইলের অধিক ভ্রমণ করেননি তিনি। পাপী-তাপী ও সমাজচ্যুতদের সঙ্গে ছিল তাঁর অবাধ সখ্যতা। অসুস্থ ও পঙ্গুদের যেমন নিরাময় করেছেন তেমনি মন্দ-আত্মা থেকেও মানুষকে করেছেন মুক্ত। তাই নিজেকে ছাড়া ছিল না তাঁর কোন পরিচয় পত্র। যার কথা বলছিলাম তিনি কোন দার্শনিক কিংবা দিগবিজয়ী রাজা ছিলেন না। ছিলেন না কোন বড় ডাক্তার বা বিজ্ঞানী। তবে মানুষ হিসাবে যা যা হওয়ার তিনি তাই হয়েছেন। তিনি মানুষের অন্তর জয় করেছেন, হয়েছেন হৃদয়ের রাজা। তাঁর পরিচয় তিনি সত্য। তাঁর পরিচয় তিনি পথ। তাঁর পরিচয় তিনি জীবন। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা যিশু। তাঁর জন্ম আমাদের সবার কাছে একটি 'সত্য', তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু আমাদের কাছে স্বর্গে যাবার 'পথ' আর তাঁর পুনরুত্থান আমাদের সবার জন্য নব 'জীবন'।

যিশুর জন্ম একটি 'সত্য' :

যিশুর জন্ম আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা তাই তাঁর জন্ম আমাদের জন্য সত্য। যিশু ঈশ্বরের ভালবাসা হয়ে আমাদের মাঝে বাস করেছেন, আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ভালবাসতে শিখিয়েছেন। তাঁর জীবন আমাদের দেখিয়েছে ভালবাসলে আমাদের একে অন্যকে শুনতে হবে। ভালবাসলে আমাকে আমার জীবনের দুর্বল দিক গুলোকে আবিষ্কার করে তা জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ভালবাসলে আমাকে নিজের এবং অন্যের জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে। ভালবাসলে সবাই আমার, আমি সবার। যিশুর ন্যায় ভালবাসতে পারলেই আমরা পরম সত্যকে আমাদের জীবনে লাভ করতে পারবো। আর বর্তমান বাস্তবতায় করোনা ভাইরাস এর কারণে মহামারির এ সময়ে আমাদের ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করে, যিশুকে আমাদের জীবনের সত্য স্বীকার করে, তাঁর ভালবাসার আদর্শ অনুসরণ করে একে অন্যকে ভালবাসতে হবে। একে অন্যের পাশে দাঁড়াতে হবে।

যিশুর মৃত্যু আমাদের স্বর্গে যাবার 'পথ':

যিশু আমাদের ভালবাসেন আর ভালবাসেন বলেই তিনি আমাদের সকল পাপ তাঁর নিজের কাঁধে নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, যেন আমরা ভাল ভাবে বাঁচতে পারি, পাপের কবলে যেন আর না পরি এবং স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করতে পারি। তাই ক্রুশে মৃত্যু বরণ করে তিনি আমাদের জন্য হয়েছেন স্বর্গে যাবার পথ। এই ক্রুশেই রয়েছে আমাদের মুক্তি, আমাদের সুখ ও আনন্দ। কারণ আমাদের মুক্তিদাতা বন্ধু যিশু জগতের সকল দুঃখ কষ্টকে সঙ্গে নিয়ে এই ক্রুশে নিজেকে সঁপেছেন। আর রেখে গেছেন আমাদের জন্য সুখ ও শান্তি। বর্তমান বাস্তবতায় তাই আসুন এই ক্রুশের দিকে তাকিয়ে আমরা করোনা থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি। যিশুর ন্যায় আমরাও নিজেকে, নিজের পরিবারকে, নিজের দেশ ও গোটা বিশ্বকে পিতার হাতে সমর্পণ করে বলি "হে পিতা তোমার হাতে অর্পণ করি আমার জীবন" আমার পরিবার, আমার দেশ, আমার বিশ্ব। আর তাহলেই হয়তো আমরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবো।

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের সবার জন্য নব 'জীবন':

পুনরুত্থান অর্থ মৃত্যুর উপর জয়লাভ, নতুনজীবনের সূচনা। যিশু পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের সবার জন্য নিয়ে এসেছেন নব জীবন। তিনি নিজে আমাদের জন্য হয়েছেন জীবন। পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাসী হয়ে জীবন যাপন করে আমরাও পেতে পারি সেই নব জীবন। আপনি যদি সত্যিই পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাস করেন এবং নব জীবন লাভ করতে চান তাহলে আপনাকে এই সংকটময় মুহূর্তে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন দেখে নিষ্ক্রিয় উদাসীন না থেকে আপনার সামর্থ্য অনুসারে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। প্রেরিতশিষ্যদের ন্যায় পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে অন্যের জীবনের জন্য নব জীবন হয়ে উঠতে হবে।

প্রিয়জনেরা আজকের ১ম ও ২য় পাঠ আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমি মনে করি বর্তমান সময়ই আমাদের কাছে সেই দায়িত্ব পালনের উত্তম সময়। তাই আসুন সামনের খোলাপথ যেমন আমাদের আহ্বান করে পথ চলতে, আলো যেমন আহ্বান করে দেখতে, কারো অনুনয় দৃষ্টি যেমন আহ্বান করে তার প্রতি সদয় হতে ঠিক তেমনি যিশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাকে 'সত্য' হিসাবে গ্রহণ করে নতুন 'পথ' খুলে, সকল বাধা পেরিয়ে, হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করে আর্তমানবতার সেবায় 'জীবন' উৎসর্গ করি॥

বিশ্ব মা দিবসে পরিবার জীবন কমিশনের সভাপতির বাণী

বিশ্ব মা দিবসে সকল মাকে জানাই শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রণাম, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মাতৃপ্রেম-ভক্তি ভালবাসা সন্তানকে, পরিবারকে গড়ে তুলে ও সুরক্ষা করে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, 'চ্যালেঞ্জ ও সংগ্রাম ছাড়া মানব জীবন অস্তিত্বহীন এবং সে কারণেই বলা যায় যে, একটি মানবশিশুর জীবনে মা কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় নয় বরং অপরিহার্য।' কেননা একজন মা হলেন জন্মদাত্রী। মা মাটি মানুষ। এই তিনটি বিষয় এক-সুতোয় গাঁথা। পিতামাতার পবিত্র ভালবাসায় মানবশিশুর একদিন মাটিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্ম হয়, মা তার গর্ভে দিনে দিনে তিলে তিলে সেই শিশুকে গড়ে তোলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা-ই সবচেয়ে বেশী আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালবাসা, আদর-শাসন দিয়ে সন্তানকে প্রয়োজনীয় গঠনদান করার ভূমিকা পালন করেন, সন্তানকে মানুষ করে তোলেন। তাই প্রত্যেক মা-কেই তার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বুঝতে হবে, এবং তা পালন করার মাধ্যমেই কেবলমাত্র সন্তান নয় কিন্তু গোটা পরিবার ক্রমে ক্রমে সুগঠিত হতে থাকে।

একজন মা সন্তানকে জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের পাশাপাশি কীভাবে সন্তানেরা সমস্যাপূর্ণ জটিল বাস্তবতায় হারিয়ে যাবেনা বরং সমস্যা-সংকট মোকবেলা করে জীবনে জয়লাভ করতে পারবে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করে থাকে। বর্তমান জগৎ একদিকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করলেও অপরদিকে তা দিনে দিনে জটিল রূপ ধারণ করছে। অনেক পরিবারে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, ভুল বুঝাবুঝি, অশান্তি-বিশৃংখলা সহ নানা ধরনের জটিল পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও হচ্ছে। সেখানে একজন মা কেবল বই-পুস্তকের বিদ্যা নয়, কিন্তু বাস্তব জীবনভিত্তিক জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতায় সন্তানসহ পরিবারের সকলকে সুন্দর ও সঠিক মানবিক এবং মঙ্গলসমাচারের মুল্যবোধের আলোকে খ্রিস্টীয় গঠনদানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করেন এবং করবেন। বর্তমান বিশ্বের প্রতিযোগিতায় পরিবারসমূহ বাহ্যিকতায় টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে। অনেকে এই অবাধ প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বিশ্বাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতাকে অনেক সময় বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছে। ফলে ব্যক্তি জীবনে, পরিবারে ও সমাজে আবেগের গতি বৃদ্ধির ফলে বিবেকের সিদ্ধান্ত নিতে অনেকে হয়তো ভুল করছেন। তাই একজন মাকে পরিবার ও সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক এই তিনটি বিষয়কেই সম্বন্বিতভাবে গুরুত্ব প্রদানসহ পরিবার ও সন্তান গঠনে আরো সক্রিয় ও আন্তরিক ভূমিকা পালন করা এখন সময় ও যুগের দাবী। এই দাবী পূরণ না হলে সন্তান ও পরিবার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবনার বিষয় বৈ কি!

সাধু পল খ্রিস্টীয় জীবন-আদর্শ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে কলসীয়দের কাছে লিখেছেন, "তোমরা তো ঈশ্বরের মনোনীত জন, তাঁর পুণ্যজন; তিনি তোমাদের ভালবাসেন। তাই তোমরা দয়া-মমতা, সহৃদয়তা, নম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতার সাজেই নিজেদের অন্তরটাকে সাজিয়ে তোল। পরস্পরের প্রতি তোমরা ধৈর্যশীল হও। আর কারো প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে তোমরা তাকে ক্ষমাই কর; প্রভু নিজে যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তেমনি তোমরাও ক্ষমা কর। আর সব-কিছুর ওপরে স্থান দাও ভালবাসাকে, কারণ ভালবাসাই সব-কিছুকে এক ক'রে তোলে, পূর্ণ ক'রে তোলে। খ্রিস্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক" *(কলসীয় ৩:১৪)*। সাধু পল এই কথাগুলো পরিবারের সকলে বিশেষ ক'রে মায়েরা যদি ধ্যান ও জ্ঞান করেন, তাহলে নিজ নিজ পরিবারকে খ্রিস্টীয় গুণাবলী চর্চা করার মাধ্যমে আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবাররূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

বিশ্ব মা দিবসে আবারও সকল মাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মায়ের চরণতলে রাখি মোদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। মায়ের জন্য প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর তাদের সকলকে বিশেষ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দান করেন। সকল সন্তানেরা যেন তাদের মাকে সবর্দা ভালবাসেন, সর্বদা করে শ্রদ্ধা-ভক্তি, তাহলেই তারাও লাভ করবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ-শক্তি।

বর্তমান বিশ্ব করোনা ভাইরাসের কারণে ভীত-শঙ্কিত। মা মারীয়া, যিনি আমাদের সকলের মা, তিনি সকল মাকে এবং আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন। তিনি বিপদের সহায়, তিনি রোগীদের স্বাস্থ্য, তিনি রক্ষাকারিণী। মা মারীয়া আমাদেরকে এই মহামারীর হাত থেকে সুরক্ষা করুন এই প্রার্থনা করি।

খ্রিস্টেতে,

বিশপ পনেন পল কুবি, সিএসসি
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল ও পরিবার জীবন কমিশনের সভাপতি

প্রভু যিশুর পুনরুত্থান ও কিছু প্রশ্ন

ফাদার অরুণ উইলিয়াম রোজারিও ওএমআই

ই-মেইল ও মোবাইল ম্যাসেজ চালু হবার পূর্বে, কার্ডের মাধ্যমে পুনরুত্থানের শুভেচ্ছা পাঠানো হত। সে কার্ডগুলোতে সচরাচর দেখা যেত চারিদিক আলোকিত করে সমাধি হতে বিজয়ের বেশে প্রভু যিশুর আর্বিভূত হবার ছবি। 'প্রভু যিশু মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন', এই হলো খ্রিস্টধর্মের মূল বিশ্বাস। কিন্তু বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নেই ঠিক রাতের কোন্ সময় প্রভু যিশু পুনরুত্থান করেন। সরাসরি যিশুকে কবর হতে পুনরুত্থিত হতে দেখেছে এমন কোন প্রত্যক্ষদর্শীর নামও বাইবেলে নেই।

প্রভু যিশু তাঁর প্রচারের সব কিছুই করেছেন সকলের সামনে। যেমন তিনি পাঁচ হাজার মানুষকে অলৌকিক ভাবে খাইয়েছেন, রোগীদের নিরাময় করেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি দান করেছেন, মৃতকে জীবন দিয়েছেন ও আরও অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করেছেন - আর সবই করেছেন প্রকাশ্য স্থানে। এমনকি তার যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুও হয়েছিল প্রকাশ্যে। তাই তার প্রচার ও অলৌকিককর্মের সাক্ষীর অভাব ছিল না। অবশ্য কিছু ঘটনা রয়েছে যা তিনি জনতার সামনে করেননি। যেমন তিনি যখন উত্তাল সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে নৌকায় আসেন, তা শুধু তাঁর ১২ জন শিষ্য দেখেছিলেন। যাইরাসের কন্যাকে জীবন দানের সময় এবং তাবোর পর্বতে তার দিব্য রূপান্তরের সময় তিনি তার একান্ত প্রিয় তিনজন শিষ্য পিতর, যাকোব ও যোহনকে সাক্ষী রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন পুনরুত্থান করেন তখন তার সমাধির সামনে কোন সাক্ষী ছিল না। অনুমান করতে পারি যে প্রহরীরা যিশুর সমাধি পাহাড়া দিয়েছিলেন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে মৃত যিশু আর সমাধিতে নেই। তাই তারা প্রধানযাজকদের কাছে সমস্ত ঘটনাটি জানান।

আমরা যদি যিশুর কাহিনীকে নতুন করে লিখতে চাইতাম তাহলে হয়তো যিশুর পুনরুত্থানে অবশ্যই একজন সাক্ষী রাখতাম। অনেকে বলেন যে পুনরুত্থিত যিশুর আর্বিভাব হওয়া উচিত ছিল জেরুসালেম মন্দিরে। তাঁর প্রথম দেখা দেওয়া উচিত ছিল পোন্তিয় পিলাতকে যিনি যিশু রাজা কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিল ও তাঁর মৃত্যুর আদেশ দিয়েছিল। পুনরুত্থিত যিশুর দেখা দেওয়া উচিত ছিল রাজা হেরোদকে, প্রধান যাজক কাইয়াফাকে ও অন্যান্য ফরিসিদেরকে, রোমীয় সেনাদেরকে যারা তাঁকে কশাঘাত করেছিল, অবজ্ঞা করেছিল। মানবীয় দৃষ্টিতে প্রভু যিশু যদি তা করতেন তাহলে সমস্ত ইস্রায়েল জাতি এবং এমনকি হয়তো নিষ্ঠুর রোমীয়রা পর্যন্ত খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়ে উঠত। মন্দের পরাজয় ও খ্রিস্টের জয় এক নিমেষেই হয়ে যেত। কিন্তু পিতা ঈশ্বর এমন কিছুই হতে দেননি। পিতা ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণ স্বাধীনতা। আর তাই মানুষকে জোর করিয়ে তিনি কোনকিছু করাতে চান না।

খ্রিস্ট ধর্ম বিরোধীরা বলে যিশু তাঁর সাথে স্বর্গে নিয়ে যান পাশে থাকা এক ক্রুশবিদ্ধ আসামীকে। "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে" *(লুক ২৩:৪৩)*। যিশু জানতেন যে তৎকালীন ইহুদী সমাজে একজন নারীর সাক্ষ্য

তুচ্ছ বলে গণ্য করা হতো। তা সত্ত্বেও পুনরুত্থানের পর সাধু পিতর, বা সাধু যোহনকে বেছে না নিয়ে দেখা দিলেন মাগ্দালার মারীয়াকে যিনি প্রথম জীবনে ছিলেন পাপিষ্ঠা। ঈশ্বর যে সর্বদাই দুর্বল, পাপী ও অসহায় মানুষের পাশে থাকেন পরিত্রাণের ইতিহাসে তা আবারও প্রমাণিত হয়। মা-মারীয়া তার প্রশংসাগীতিতে যথার্থই বলেছেন, "যত নৃপতিকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনেছেন, আর দীনমানুষকে তিনি বসিয়েছেন উচ্চ আসনে" *(লুক ১:৫২)*।

যিশুর প্রকাশ্য জীবনে তিনবার তিনি তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন *(মার্ক ৮:৩১, মথি ১৬:২১, লুক ৯:২২)*। অবাক হবার বিষয় যিশুর গ্রেফতার হওয়া, যাতনা-ভোগ ও মৃত্যুর পর শিষ্যরা এত ভীত ও হতাশ হয়ে পড়েছিল যে তারা একবারও যিশুর উচ্চারিত সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে করেননি। তারা ভেবেছিল যিশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে যিশুকে যারা হত্যা করেছিল, তারা যিশুর এই ভবিষ্যদ্বানী ভুলে যায়নি। যিশুর সমাধির পর প্রধানযাজকেরা ও ফরিসিরা একসঙ্গে পিলাতের কাছে অনুরোধ করেছিল যেন তৃতীয় দিন পর্যন্ত সমাধিটা প্রহরী মোতায়েনে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয় *(মথি ২৭:৬২-৬৬)*। কি অদ্ভুত চিত্র! যারা ছিল যিশুর শিষ্য তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের আশা করেনি, অথচ তার শত্রুরা ঠিকই ভেবেছিল যে যিশুর মৃত্যুর প্রথম তিনদিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে যিশুর শত্রুরাই প্রথম, যারা বুঝতে পেরেছিল যে যিশু পুনরুত্থান করবেন। আর তাই যিশুর পুনরুত্থানের সত্যকে তারা গোপন করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করেছিল *(মথি ২৮:১১-১৫)*।

পুনরুত্থিত যিশু যখন শিষ্যদের দেখা দেন তখন তার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমত তার অভিবাদন ছিল 'তোমাদের শান্তি হোক' ও দ্বিতীয়ত তিনি শিষ্যদের তাঁর হাত ও পায়ে পেরেকের দাগ ও বুকের ক্ষত দেখান। ঐশতত্ত্ববিদদের মতে পুনরুত্থিত যিশুর দেহে কোন ক্ষত থাকার কথা নয়। কারণ গৌরবান্বিত দেহ হলো সম্পূর্ণ এক নতুন সৃষ্ট যা নিখুঁত ও অতি পবিত্র। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, মঙ্গলসমাচার লেখক সাধু লুক ও সাধু যোহন এর মধ্য দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছেন! তারা দেখাতে চেয়েছেন যে প্রভু যিশুর পঞ্চক্ষত প্রমাণ করে যে, মানবসমাজ ঈশ্বরপুত্রকে অস্বীকার করেছে, নির্যাতন করেছে এবং হত্যা করেছে। মানুষের অন্যায় ও পাপের পরও পুনরুত্থিত যিশুর মধ্যে নেই কোন শাস্তি দেবার বাণী, নেই কোন প্রতিশোধের বাণী। এই পঞ্চক্ষত দেখানোর পর 'তোমাদের শান্তি হোক' এই শুভেচ্ছা বার্তার মধ্য দিয়ে পুনরুত্থিত যিশু বলতে চেয়েছেন, এটি সত্য যে তোমরা আমাকে অস্বীকার করেছ, পরিত্যাগ করেছ, আমার পাশে থাকনি, বিশ্বাসে অটল ছিলে না, কিন্তু তারপরও আমি তোমাদের উপর রাগ করিনি। দেখো, আমি পুনরুত্থিত ও ফিরে এসেছি। তবে তোমাদের কোন শাস্তি দিতে নয়, আমি এসেছি তোমাদের আলিঙ্গন করতে, তোমাদের শান্তি দিতে, কারণ আমি তোমাদের ভালবাসি।

পুনরুত্থিত যিশুর অভিবাদন ও পঞ্চক্ষত তাঁর নিঃশর্ত ভালবাসা, ক্ষমা ও আমাদেরকে তার কাছে টেনে নেবার পরিচয় বহন করে। যিশুর পুনরুত্থানে সবচেয়ে বড় দুটো সর্বজন স্বীকৃত প্রমাণ হলো শূণ্য সমাধি ও বিভিন্ন সময়ে শিষ্যদের, স্ত্রীলোকদের ও অন্যন্যাদের কাছে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর আর্বিভাব বা দর্শন দান এবং যুগে যুগে অসংখ্য খ্রিস্ট বিশ্বাসীর সাক্ষ্য, পবিত্র জীবন, খ্রিস্ট বিশ্বাসের জন্য জীবন দান। আর একজন বিশ্বাসীভক্তের কাছে এর থেকে বড় আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সাধু পল যর্থাথই বলেন, "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন" *(১ করিন্থীয় ১৫:১৫)*।

শোকার্ত মা মারীয়া

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: ঈশ্বর কর্তৃক অনুগৃহীতা মারীয়া, নারীকূলে ধন্যা উপাধিতে নিজেকে গৌরবান্বিত এবং সরল ও নম্রতায় বিশ্ব মানব জাতির কাছে হয়েছেন অভিনন্দিত ও পেয়েছেন জননীর অধিকার। স্বর্গদূত দ্বারা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে মারীয়া যতটুকু বিচলিত হয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী চিন্তিত ছিলেন যে গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে তা পালন করা কত যে কষ্ট সাধ্য এবং মানবিক দৃষ্টিতে সহ্য করে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা সম্ভব কি না বিষয়টি তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল সন্দেহ নেই।

নারীজাতির মধ্যে মারীয়াকে নবীনা হবা নামেও আখ্যায়িত করা হল। কিন্তু প্রথম হবা জগতে নিয়ে আসলেন পাপ আর নবীনা হবা মারীয়া আনলেন তাঁর পুত্রের মাধ্যমে মানব জাতির পরিত্রাণ। নিজেও পরিত্রাণ কাজে প্রভূত অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল ঈশ্বর পুত্রের জননী হয়েও দুঃখ-কষ্ট, আঘাত পাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাননি। সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিয়সী নারী ও বিশ্ব জননী উপাধি পেয়েও মারীয়াকে পেতে হয়েছে চরম সাতটি আঘাত। তারপরও বিভিন্ন স্থানে দর্শন দিয়ে তাঁর কষ্টের কথা, দুঃখের কথা স্বীকার করে মানুষের পাপ স্বভাব ত্যাগ, প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকা, ক্ষমা, ভালবাসা, সহনশীলতা, ধৈর্য দ্বারা নতুন পৃথিবী, নতুন মানুষ সৃষ্টিতে সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

মা-মারীয়ার জীবন দর্শন, ধ্যান এবং তাঁর ত্রাণদায়ী কাজের প্রতি অনুগত হয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য তাঁর আবেদন। পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন আমরা যেন হতাশ বা নিরাশ না হয়ে বরং মা-মারীয়ার সপ্তশোকের ধ্যান করে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি ঈশ্বরের পরিকল্পনা। অবশ্য মারীয়ার যে কোন একটি কষ্টের তুলনায় আমাদের কোন কষ্ট নিতান্ত সহনীয় ও লাঘবযোগ্য। অতএব শোকার্ত মায়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর নির্দেশিত শিক্ষা, জীবন ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা যেন মা-মারীয়ার বিশ্বস্ত ভক্তে পরিণত হতে পারি। আমাদের দুঃখ-কষ্ট, সুখ-আনন্দ, সব কিছু মারীয়ার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি এবং প্রার্থনা জানাই তিনি যেন আমাদের শক্তি, ধৈর্য ও সাহস দেন যেন সব কিছু ঈশ্বরের

ইচ্ছা বলে মেনে নিয়ে বিশ্বাসে অটল থাকতে পারি।

মারীয়ার সপ্তশোক: মা-মারীয়াকে যে সকল দুঃখ-কষ্ট ও শোক বহন করতে হয়েছিল সেগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত বটে। কিন্তু জাগতিক সংসারে থেকেই এগুলো সংঘটিত হয়েছিল। তাছাড়া এগুলো ভাববাদীদের দ্বারা কথিত, বাস্তবসম্মত ও বিধান মোতাবেক। মারীয়া নিজ থেকে এগুলো কামনা বা প্রত্যাশা করেননি অথবা কাঙ্খিত নয়। তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। বলতে গেলে নীরবে ধৈর্য সহকারে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে এমনটি ধরে নিয়ে তিনি সাধ্যমত তা পালনে সচেষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছার স্বীকৃতি স্বরূপ। মানবিক দৃষ্টিতে এসব আঘাত সাধারণভাবে সহ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত, বিশ্বস্ত এবং মানব মুক্তির কাজ ত্বরান্বিত করতে পুত্র যিশুর সহযোগী হিসেবে পালন করেছেন।

মা-মারীয়ার সপ্তশোকগুলো হচ্ছে: ১ম- যাজক শিমোন কর্তৃক কষ্টকর ভবিষ্যদ্বাণী। ২য়- মিশর দেশে পলায়ন। ৩য়- যিশুকে মন্দিরে হারানো। ৪র্থ- যিশুর ক্রুশবহন দর্শন। ৫ম- যিশুর মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শন। ৬ষ্ঠ- পুত্র যিশুর মৃতদেহ কোলে স্থাপন। ৭ম- যিশুর সমাধি দর্শন।

পবিত্র আত্মায় গর্ভবতী হয়ে মারীয়া ঈশ্বর পুত্রের জন্ম দিয়ে হলেন ঈশ্বর ও মানব জাতির জননী। আবার সেই পুত্রের কারণে জাগতিক সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টের সহভাগি হয়ে মানব জাতির মধ্যে হলেন মহিয়সী, স্বনাম ধন্যা, রোগীদের স্বাস্থ্য, পাপীদের আশ্রয়, দুঃখীদের সান্ত্বনাদায়িনী, খ্রিস্টানদের সহায়, শান্তির রাণীসহ ৫০টি বিশেষ গুণের অধিকারিণী। এগুলো মাতামণ্ডলী জপমালা প্রার্থনার মধ্যে প্রতিনিয়ত জপ করার জন্য মারীয়ার ভক্তবৃন্দদের আহ্বান করেন। মারীয়ার সপ্তশোকের মালা আবৃত্তির দ্বারা ভক্তবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারে মায়ের জীবন দুঃখ-কষ্ট বর্জিত নয়। বরং এগুলো দৈনন্দিন জীবনের ক্রুশ মনে করে সহনশীলতা ও ধৈর্যসহকারে তা পালন করার মধ্যে যে আনন্দ ও গৌরব আছে তা উপলব্ধি করা।

নারী জাতির শোকার্ত জীবন: মা-মারীয়া

ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত নারী যিনি একাধারে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন আবার দুঃখ-কষ্ট ও আঘাতে জর্জরিত হয়ে ধৈর্য-সহ্য ও বিশ্বস্ততার পরিচয়ে আশিষ ধন্য হয়েছেন সর্বযুগে, সর্বকালে। নারী বলতেই সর্বদা সুখে, শান্তিতে, আনন্দে জীবন কাটাবে এটা কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকে নির্ধারিত হয়নি। হবার কৃত অপরাধে প্রথম কষ্ট, সন্তান প্রসব বেদনা ধার্য করা হয়েছে। অতএব সংসার জীবনে কষ্টের যাত্রা সেখান হতেই শুরু। পরবতীতে স্বামী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামীর ঘরের আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এমন কি নিজ বংশের মানুষ দ্বারা আঘাত, কষ্ট-দুঃখ প্রতিদিনকার ঘটনা। কিন্তু মারীয়ার জীবনে যে সব দুঃখ-কষ্টের চিত্র এক নয়। পরিস্থিতির স্বীকার, পারিবারের কাঠামো, মানুষের মনমানসিকতা, ব্যবহারিক চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, মৌলিক অধিকার সমূহ, ধর্মীয় অনুভূতি, বিশ্বাস ও ঈশ্বর ভীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে নারী জাতির সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্টের জীবন গড়ে উঠে। তবে একথা সত্য যে, ঈশ্বর কোন মানুষকে এমন কোন দুঃখ-কষ্টের বা সমস্যা দেন না যা সহ্য করা দুরূহ বা সম্ভব নয়। মানুষ দ্বারা সৃষ্ট পাপ, রোগ শোক আবার তাদের শুদ্ধিতা, চেতনা, পরিবর্তন, প্রার্থনা, বিশ্বস্ততার দ্বারা সুখী সুন্দর জীবন যাপনের উপায় ও বিধান রয়েছে।

আমরা একথা যেন মনে না করি, দুঃখ-কষ্ট, রোগ শোক ব্যতিরেকেই জীবন কাটাতে পারব। এগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের একটি মাধ্যম যদিও তা কারো কাম্য নয়। এগুলো অবশ্যই থাকবে তবে ঈশ্বর নির্ভর থাকলে, বিশ্বস্তভাবে কাজকর্ম করলে, মানুষের কল্যাণে ও সাহায্যে এগিয়ে আসলে, যা ক্ষতিকর এমন কিছু থেকে বিরত থাকলে হয়তো ঈশ্বর আমাদের দুঃখ-কষ্ট অনেকটা লাঘব করবেন। কৃতকর্মের উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। ভাল কাজে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রার্থনা একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নারী সমাজ আজ অনেক বিষয়ে সচেতন। হিংসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, সমালোচনা, অহেতুক হয়রানি, নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। স্বামী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত নির্দেশিত পথের যাত্রী হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। যে ভালবাসার ফসল স্বরূপ মারীয়ার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর পুত্রকে আমরা লাভ করেছি, সে ভালবাসা সকলের মধ্যে প্রচার করলেই আমরা হয়ে উঠতে পারব ঈশ্বরের সন্তান।

উপসংহারঃ মারীয়ার জীবন আলোকে সকল স্তরের মানুষের জন্য মূলমন্ত্র- যে কোন পরিস্থিতিতে কেহ যেন হতাশ না হয়। মারীয়ার মত নীরব ভূমিকা পালনে এ শিক্ষা গ্রহণ করে প্রভুর ইচ্ছা বুঝতে ও দুঃখ-কষ্ট ভোগে সহনশীল মনোভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রার্থনা ও অনুগ্রহ লাভে বিশ্বাসে অটল থেকে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়, ঐক্যবদ্ধ এবং আত্মায় এক থেকে সহভাগিতার জীবন যাপনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মারীয়া যেমন ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিলেন আমরাও মা-মারীয়ার মত প্রার্থনায়, ধৈর্যে, শুদ্ধতায় একাত্ম হয়ে কৃপা ও অনুগ্রহ লাভে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

১৯তম মৃত্যু বার্ষিকী

তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে

২২তম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত বিচিত্রা রোজলিন গমেজ
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা কেমন আছ? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা শত দুঃখ কষ্টেও শুধুমাত্র তোমাদের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাদের কথা মনে হলে প্রাণ বারবার কেঁদে ওঠে। এ জগৎ সংসারে তোমাদের সুন্দর জীবন আদর্শের গুণাবলী আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়। নিশ্চয়ই তোমরা বাবা-মেয়ে স্বর্গে প্রভুর সাথে সুখে আছ। স্বর্গ হতে প্রতিনিয়ত তোমরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর, আমরা যেন তোমাদের জীবনের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি।

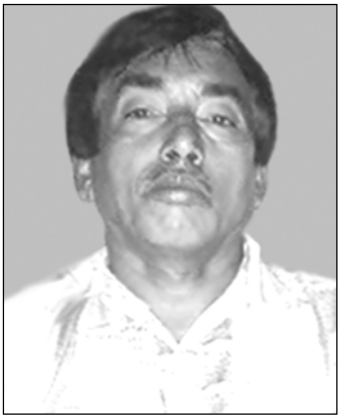

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ মে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : শিশিলিয়া গমেজ

ছেলে ও ছেলে বউ : দিলীপ-পুষ্প, অনুপ-সম্পা, অসীম-চামেলী ও ব্রাদার রিপন সিএসসি

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুচিত্রা-হেনরী, সুমী-অপু এবং ভুবন

নাতি-নাতি বউ : জনি-শশী, নিবিড়, অর্পণ ও অনুরুদ্ধ

নাতিন ও জামাই : হ্যাপী-অনিক, কিশোরী-সুজন, বিন্দু-রেক্সি, বৃষ্টি, অন্তী, অর্থী, নদী, অর্না, রিমঝিম ও অরিন।

তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

বিপ/৮৬/২০

আমি খুঁজেছি তোমায় মাগো

এ্যাগনেস আনন্দ ম্যাকফিল্ড

ভূমিকা: মা একজন নারী, যিনি গর্ভধারণ, সন্তানের জন্ম তথা সন্তানকে বড় করে তোলেন। তিনিই অভিভাবকের ভূমিকা পালনে সক্ষম ও মা হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। প্রকৃতিগতভাবে একজন নারী বা মহিলাই সন্তানকে জন্ম দেয়ার অধিকারীনি। গর্ভধারণের ন্যায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অবস্থান থেকেও মা সংজ্ঞাটি বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে।

মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন-

মা দিবস বা মাতৃ দিবস হল একটি সম্মান প্রদর্শন জনক অনুষ্ঠান যা মায়ের সম্মানে এবং মাতৃত্বের মহিমা প্রকাশের জন্য উদ্‌যাপন করা হয়। এটি বিশ্বের অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন দিনে, সাধারণত মার্চ, এপ্রিল বা মে মাসে উদ্‌যাপন করা হয়।

বিশ্বের সর্বত্র মায়ের এবং মাতৃত্বের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়। এগুলো অনেক প্রাচীন উৎসবের সামান্য প্রামাণিক সাক্ষ্য, যেমন, সিবেল গ্রিক ধর্মানুষ্ঠান, হিলারিয়ার রোমান উৎসব যা গ্রিকের সিবেল থেকে আসে। সিবেল ও হিলারিয়া থেকে আসা খ্রিষ্টানগণ মাদারিং সানডে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতো। কিন্তু বর্তমান সময়ের মা দিবস আমেরিকান উদ্ভাবন যা সরাসরি সেই সব অনুষ্ঠান থেকে আসে নি। তা সত্ত্বেও কিছু দেশসমূহে মা দিবস সেই সব পুরানো ঐতিহ্যের সমার্থক হয়ে আছে। ছুটির দিনটি ক্রমান্নয়ে এতই বাণিজ্যিক হয়ে পড়ে যে, এটির স্রষ্টা আনা জার্ভিস একটি 'হলমার্ক হলিডে' অর্থাৎ যে দিনটির বাণিজ্যিক প্রযোজনীয়তা অভিভূত করার মত, ঠিক ঐ রকম একটি দিন হিসেবে বিবেচনা করেন। তারপর তিনি নিজেই নিজের প্রবর্তন করা ছুটির দিনটির বিরোধিতা করতে শুরু করেন।

নাতিদীর্ঘ মানুষের জীবন-

নাতিদীর্ঘ মানুষের জীবনে ভুলে যাওয়ার এবং মনে পড়ার ঘটনা সীমাহীন। কত স্মৃতি স্মৃতির প্রান্তরে আত্মাহূতি দেয়, আবার কত স্মৃতি ফিরে আসে স্মৃতির পুরানো পথে। তবে শৈশবের ঘটনাই মানুষের মনে থাকে বেশী, ব্যাকুল করে তোলে। আবেগ তাড়নায় শুধু একটি মুখ মানসপটে উঁকি দেয় বার বার। আর সে হল মমতাময়ী মায়ের মুখ। মাকে নিয়ে কার না ভাবতে ভাল না লাগে... 'মা' একটি অক্ষরই , একটি ছোট্ট শব্দ, 'মা' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার। তাঁর আচঁলেই যেন সন্তানের ঠাঁই। 'মা' আমার এক অজানা রহস্য, সৃষ্টির চুম্বক শক্তি অদৃশ্য অভিব্যক্তি।

মমতাময়ী মাকে নিয়ে বহু গান, কবিতা, গল্প ও কাহিনী রচিত হয়েছে । যেমন-

মাগো মা ওগো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা- খুরশিদ আলম ।

মায়ের একফোঁটা দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম- ফকির আলমগীর

এমন একটা মা দেনা- ফেরদৌস ওয়াহিদ

পৃথিবীর একপাশে মাকে রেখে অন্য পাশেও, মাকে রাখি- আরফিন রুমি

বলাবহুল্য, বেশ কয়ের বছর আগে ক্লোজ-আপ ওয়ানে রাশেদের কণ্ঠে গাওয়া আরেকটি গান মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল- *আমি খুঁজেছি তোমায় মাগো, আমি খুঁজেছি তোমায়-* ব্যান্ড দলের জেমস-এর একটি সুকণ্ঠ গান সুপার হিট হয়েছে, *ঐ আকাশে লুকিয়ে আছে মা, কোথায় আছে, কেমন আছে মা...*

শৈশবের মধুর আমার মায়ের আদরের স্মৃতি-

শৈশবের মায়ের আদরের স্মৃতি সন্তানের মনে দাগ কাটে। নাতিদীর্ঘ মানুষের জীবনে ভুলে যাওয়ার এবং মনে পড়ার ঘটনা সীমাহীন। কত স্মৃতি, স্মৃতির প্রান্তরে আত্মাহূতি দেয়, আবার কতক স্মৃতি ফিরে আসে স্মৃতির পুরানো পথে। তবে শৈশবের কথাই মনে থাকে বেশী। কারণ জন্মের পরই সন্তান প্রথমে মায়ের মুখটিই দেখে। তখন মা তার বিগত কয়েক মাসের কষ্টকে ভুলে যায় সন্তানের মুখ দর্শনে। শৈশবে সেই হাঁটি হাঁটি পা পা থেকে শুরু করে সন্তানের প্রতিটি ধাপ মায়ের জানা। সন্তান সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় মায়ের উপরই। যত সমস্যার মাঝেও সন্তান মায়ের কোলে নিরাপদ।

পৃথিবীর মা আমাদের নিয়ে যেমন ভীষণভাবে চিন্তা করেন ও ভালবাসেন, তেমনি স্বর্গীয় মা-ও আমাদের গভীরভাবে ভালবাসেন। আমাদের জাগতিক মায়েরা পরলোকগত হন কিন্তু স্বর্গীয় মার কোনদিনও শেষ নেই। তিনি আমাদের হৃদয়ের গভীরে বিদ্যমান। আমাদের মনের প্রত্যেক চিন্তা, আমাদের আত্মার প্রত্যেক আকাঙ্খা, আমাদের অন্তরে নিহিত তাঁর উপস্থিতির উপরে নির্ভর করে। হে অদৃশ্য... প্রাকৃতিক ও অতি প্রাকৃতিক গুণে তুমি আমাদের অন্তরে থাকো। কিন্তু আমাদের বিবেকের অন্তরতম স্থানে তোমার কণ্ঠ আমরা যেন চিনে নিতে পারি। যদিও আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে প্রলোভিত হতে পারি, কিন্তু তুমি আমাদের ছেড়ে যাওনা কখনোও।

মায়ের মত আপন কেহ নাই রে-

মা, মাটি, দেশ ও গ্রাম- মাঝে মাঝেই মনে হয় আমি এখন আমার শৈশবে বেড়ে ওঠা গ্রামের সবুজের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই বিশাল সবুজ ধানের ক্ষেত আর ক্ষেত। যেন হাওয়ায় দোলায়িত এক বিশাল সবুজ চাদর। হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল শৈশব ও কৈশরের স্মৃতি বিজড়িত মুহূর্তগুলো। আমার বেড়ে ওঠা নদীপাড়ের ছোট্ট একটি গ্রামে। আজ এই সুন্দর মাহেন্দ্রক্ষণে ভীষণভাবে মনে পড়ছে মাকে যেন এক্ষুনিই ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। মন তো আর বাধাঁ মানে না, বুঝে না। অলীক হাজারো চিন্তা মনের মধ্যে উঁকি দেয়, তাঁকে আর একবার দেখার ভীষণ সাধ জাগে মনে- আবার হঠাৎ যদি নিখোঁজ হওয়া সেই মা এসে সামনে দাঁড়ায় ... আমার প্রথম অনুভূতি কেমন হবে? সেটা ভেবেই মনটা দুরু দুরু করে ওঠে, আনচান্ করে। বহুদিনের এক প্রতিক্ষার পাহাড় জমে আছে মায়ের মধুর হাসিমাখা মুখটা দেখার জন্য। সেই এলোমেলো ভাবনাগুলোই নির্জন ছায়াতলে টেনে নিয়ে যায় পরিচিত মায়াময় গ্রামবাংলার মেঠোপথে। সেই গ্রামটি যেন আর আগের মত নেই। সারাদিনের ক্লান্তি মুছে ফেলার জন্য কেউ হেঁটে বেড়ায় না, বিকেলের গোধূলি আকাশটার নীচে। পাকা ধানের উপর উপচে' পড়া অপরূপ সোনালী রোদের ঝলসানো আলো এখন আর তাদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় না। যান্ত্রিক জীবন-যাত্রা কেড়ে নিয়েছে তাদের অনুভূতিগুলোকে। ঐ যে দূরে বাঁকা কালো গাঁও বৈদ্যুতিক বাতি এসে সেও আজ আলোকিত হয়ে আছে। আকাশে নেই পাখিদের কিচির-মিচির ডাকাডাকি, নেই নদীতে মাছ, কারখানার বর্জে ভরে আছে নদীবক্ষ, তাই নদীতে আজ আর হয় না খেয়া পারাপার।

বাংলা আমার মা, বাংলা আমার প্রাণ-

যতকিছুর মূল্যেই হোক এই সবুজ প্রান্ত ঘেরা ছোট্ট এই গ্রাম। হ্যাঁ এটিই আমার মায়ের মতন। যেখানে এক সময় মায়ের সাবালক

পরিশ্রমী হাতটি ধরে শিশু বয়সে হেঁটেছি, সবজি ক্ষেতে গিয়ে ফসল তুলে মায়ের আচঁলে রেখেছি, যে মায়ের উপর নির্ভয়ে ভরসা রেখেছি। বাড়ীর পাশে সেই হিজল গাছটাও যেন আজ আর নেই, যার শিকড়ের মধ্যিখানে মাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। গ্রামের এই বাড়ীটি আমার খুবই প্রিয়, কারণ; এখানেই মায়ের গন্ধ এখনও বাতাসে দোল খায়, যেখানে তিনি তাঁর সমস্ত ওম উজার করে আমাকে পরম যত্নে লালন-পালন করেছেন। কাছে কিংবা দূরে কেমন আছ মা, আজো কি বেঁচে আছ? খুব জানতে ইচ্ছে করে , মা ও- মা... ? বার বার কেবলই মনে পড়ে তোমাকে, খু..উ..ব বড় বেশী মনে পড়ে, দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে তোমাকে ভাবতে গিয়ে, তোমাকে ভাবা সেইতো আমার আর্শিবাদ।

পরিবারে মা-ই পারেন ভবিষ্যত প্রজন্মকে নতুন জীবন দেখাতে (যদি পাশে থাকেন বাবা)-

ঘড়ির কাঁটা যেন থেমে নেই। প্রতিটি মুহূর্তেই জীবন থেকে একটি একটি করে সেকেণ্ড হারিয়ে যাচ্ছে। যারা সেকেণ্ড ধরে ধরে জীবনকে রাঙাতে পারে, তারাই একসময় সাফল্যের শীর্ষে পা রাখে। প্রতিটি মুহূর্তকে রাঙিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মায়ের সংগ্রাম। তাই তাদের এখন সংগ্রাম করতে হবে; ঈশ্বরের সান্নিধ্য যে এখন একান্ত জরুরী বিষয়-পরিবারে একমাত্র পিতা-মাতা-ই পারেন অগ্রণী ভূমিকা রাখতে, যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে তাদের কাউন্সিলিং দিতে, সময় দিতে, তাদের নিয়ে এক সঙ্গে ঘুরতে, ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র বাইবেল পাঠে উৎসাহিত করতে, তারপর মণ্ডলীর জন্য একজন যোগ্য সভ্য-সভ্যা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে । তাদের সুস্বাস্থ্য, নিরাপদ খাদ্য সন্ধান, আলো-তাপ, সুষম খাদ্য, পড়াশুনা, তাদের সংসার জীবন, তাদের জন্য সঠিক পন্থায় সঞ্চয়, ধর্মীয় জীবনের আহবানের পরামর্শ দান, নৈতিকতা শিক্ষা, অন্যকে ক্ষমা করা, এই উদ্যোগগুলো পরিবার থেকেই নিতে হবে। পৃথিবীতে একটা বিষয় আছে যা সমপরিমাণে বন্টন করা হয়েছে তা হচ্ছে, 'সময়'- জীবন আমাদের কাছে খুব কষ্টদায়ক বলে মনে হয়। বন্ধুবর্গ দুঃখ দেয়, যে লোকদের আমরা খুব ভালবাসি, তারা আমাদেরকে বুঝে না, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের সহায় হতে ইচ্ছুক। আমরা সীমিত জ্ঞানে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝি না। খাঁটি ও বিশুদ্ধ জীবন্ত জল যা আমাদের পান করা উচিৎ। মানব হৃদয়ের তৃষ্ণা যা শুধু খ্রিস্টই নিবারণ করতে পারেন। আজই সেই দিন, বেছে নেওয়ার দিন প্রভুর উপস্থিতি গ্রহণ করার উপযুক্ত দিন। আমরা অনেক সময় দুর্ভাবনায় মানসিক চাপের মধ্যে বাস করি এবং ভুলে যাই যে, আমাদের সঙ্গে এক 'অদ্বিতীয় ঈশ্বর' আছেন যিনি আমাদের জীবনের সবকিছুর তত্ত্বাবধান করেন। এখন আমাদের পক্ষে খ্রিস্টের উপস্থিতির অন্বেষণ করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই নেই। আমরা ফোনে, অনলাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করি, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য ব্যয় করতে দিনে মাত্র এক ঘন্টাও সময় পাই না। পৃথিবী এখন এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে যে, লোকেরা বিক্ষুব্ধ অবস্থায় চলাফেরা করে, মানসিক চাপ, কাজের চাপ, প্রযুক্তি যা আমাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে বিপরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। একমাত্র মা-ই পারেন সন্তানের পাশে বন্ধু হয়ে থেকে বাহু ডোরে তাদের বেঁধে রাখতে।

ও আমার চক্ষু নাই-

ও আমার চক্ষু নাই ! চোখ থেকেও অনেক সময় আমরা অন্ধ হয়ে থাকি। আলোর ঝলকানি আমাদের চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে চারপাশে সব দেখে মনে হয় কেউ কি বাস্তবতায় নেই? আর বাস্তবতায় থাকলে খারাপ কাজগুলোকে কি করে বলি, আহ্ বেশ বেশ! এখন মাকে মারা বেশ! শাশুড়ীকে মারা বেশ! সেই দৃশ্য সামাজিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া বেশ! নিষ্ঠুরভাবে পেটানোর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করাও বেশ! অদ্ভুত এক সমাজে এখন বাস করছি আমরা, সামনে আরো যে কি দেখার আছে জানেন শুধু পিতাই। হিংসা, বিদ্বেষ এখন স্বাভাবিক বিষয়।

ছেলে আমার মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার, মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এপার-ওপার। নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামী দামী, সবচেয়ে কম দামী একমাত্র আমি। ছেলে আমার, আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম, আমার ঠিকানা তাই 'বৃদ্ধাশ্রম'। এই গানের কথাগুলো ভারতবর্ষের বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার নচিকেতার। 'বৃদ্ধাশ্রম' শব্দটি আমাদের মানবজীবনের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই আতংকের বিষয়। বর্তমানে আমাদের পরিবারগুলোতে সত্যি বলতে কি খুব কম মা-বাবারই সৌভাগ্য হয় সন্তানদের সাথে থেকে পরিবারকে উপভোগ করা। 'বৃদ্ধাশ্রম' শব্দটি শুনলেই আমার প্রচ- কষ্ট হয়। কষ্ট হয় সেই সব সমাজপতি বা ব্যক্তিদের উপর, যারা বৃদ্ধাশ্রম নামে একটি আশ্রয়কেন্দ্র খুলেছেন। আর সেই বৃদ্ধাশ্রম পূর্ণ করার জন্য বাবা-মায়ের আদরের বৌদেরকে দায়ী করা হচ্ছে। অনেকটা যে সত্যি হচ্ছে না তা আবার আমি বলছি না। যে ছেলে/সন্তানকে মা-বাবা ছোট থেকে আদর-যত্নে লালন-পালন করে বড় করেছেন আজ তারাই থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিছু বিলাসিতা করার জন্য সন্তানেরা তাদের বৃদ্ধ অসহায় মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসার চিন্তা-ভাবনা আমাকে পীড়া দেয়। সদ্য ঘটে যাওয়া এক সত্যি ঘটনা ফেসবুক মারফত জানতে পারলাম ব্যারিস্টার ছেলে এক ব্যারিস্টার মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে তোলে। কিন্তু বাধ সাধে ব্যারিস্টার স্ত্রী। স্বামীর মাকে তাদের সাথে রাখা যাবে না। তাই ব্যারিস্টার ছেলে বাধ্য হয়ে মায়ের ছোট্ট একটা পুটলীতে তার অপারগতার কয়েক লাইন চিঠি লিখে রেল লাইনের পাশে ফেলে রেখে যায়। আচ্ছা! কোন ছেলে যদি না চায় বৌ-এর কোন সাধ্য নেই মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে বা অন্য কোথাও রেখে আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে মা-বাবাদেরও উচিত ছেলের সংসারে মানিয়ে চলার মানসিকতা রাখা। যদিও এই মন-মানসিকতা আমাদের মাঝে বর্তমানে খুবই কম। তারা ভাবেন ছেলের সংসার মানেই আমার নিজের সংসার। আর সেখানেই ঘটে বিপত্তি।

ঐ আকাশের তারায় তারায় মা...

'মা' শব্দটি ছোট হলেও এর বিশালতা ব্যাপক। 'মা' শুধু একটি শব্দই নয়, ভালবাসা, আবেগ, মমতা সবকিছুই যেন মিশে আছে শব্দটির মাঝে। পৃথিবীটা স্বার্থপর। সবাই শুধু নিতে চায়, কেউ দিতে চায় না। একমাত্র মা-ই নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে যান। কিছুই নেন না। মায়ের প্রতি ভক্তি ভালবাসা প্রকাশ করেছেন অনেক জ্ঞানীগুণীজন। আমাদের নিশ্চয় মনে আছে বায়েজিদ বোস্তামীর মাতৃভক্তির কথা, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের মাতৃভক্তির কথা। মায়ের ঋণ কোন দিনও শোধ হওয়ার নয়। জনম দুঃখিনী মা আমাদের মাতৃগর্ভে নিয়ে ১০ মাস ১০দিন নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ পর্যন্ত মাকে সহ্য করতে হয় কত যে বেদনা, তা শুধু জানেন মা-ই। বর্তমানে আশার কথা হল বর্তমান সরকার মা-বাবার প্রতি অবহেলা সহ্য না করার ফরমান জারী করেছেন। যে কোন মূল্যে হোক মা-বাবা কোনভাবে অবহেলিত হয়ে থাকলে সেই অধম সন্তানদের প্রতি সরকার শাস্তিমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এটা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

মা, তুমি মহিয়সী, ঈশ্বরের মহাদান

ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু

ঈশ্বর ও মানুষকে ভালবাসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঈশ্বর যুগে যুগে এ জগতে পাঠিয়ে থাকেন। মা, তুমিও কি তাদের একজন নও? হ্যাঁ, তুমি অতি বিশ্বস্ততার সাথে-ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করেছো অভাবি, দীনদুঃখীদের প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে যাদেরকে তুমি সুপরামর্শ, সহানুভূতি ও অর্থ দিতে, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে। কেউ না জানুক আমি তা' জানতাম। চাওয়া-পাওয়ার কিছু ছিল না তোমার, নাও নি কিছু, দিয়েছো

অনেক। মানুষকে আপন ভেবে কাছে টেনেছো সহৃদয়তা ও ভালবাসায়। সরলমনে প্রকাশ ও সহভাগিতা করতে তাদের কাছে। প্রার্থনাশীল মা তুমি, এত অসুস্থতার মাঝেও মিসায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলে-অসুস্থ অবস্থায়ও মিসায় যেতে। তাইতো আমার কাছে তুমি জীবন্ত সাধ্বী।

তুমি ঈশ্বরের কত প্রিয়! স্বর্গীয় কাননে উত্তম ও সুগন্ধ ফুলরূপে এখন পৃথিবীতে ও স্বর্গকাননে সুগন্ধ ছড়াচ্ছো। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, সত্য-সুন্দর-জীবন, নীরব পরিশ্রমী, ত্যাগি ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ মহিয়সী মা তুমি। ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের জন্য তোমার ছিল অবিরাম প্রার্থনা। তুমি শুধুমাত্র তোমার ১০ সন্তানেরই মা ছিলে না; প্রত্যেক ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের সন্তানের মতই ভালবেসেছো। অনেককে দিয়েছো মায়ের স্নেহমাখা আদর ও ভালবাসা। ছিলে মার্থার ভুমিকায়, যেমনি অতিথিবৎসল কর্মব্যস্ত, তেমনি মারীয়ার ভূমিকায় নীরব ও প্রার্থনাপূর্ণ-দিনে ৭টি রোজারি মালা করতে। পরিবারেই গড়ে তুলেছো গৃহ-মণ্ডলী। 'দানেই আনন্দ'-ছিল মূলমন্ত্র। সবাইকে দিয়ে গেছো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। তুমি ধার্মিকা মা, ছিলে তুমি নগন্য, মা মারীয়ার মত ক্ষুদ্র-দীনহীনা। এখন তুমি জগতে ও স্বর্গেও মহিমান্বিত ।

এতক্ষন বলছিলাম আমার মা, যোসফিন কোড়াইয়ার কথা। ১০ সন্তানের মা স্বামীহারা হয়েও প্রত্যেক সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন এবং ছয় সন্তানের মধ্যে তিনজন ফাদার, তিনজন সিস্টার করে প্রৈরিতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমন একজন সাধ্বী মহিয়সী মায়ের সন্তান আমি। হ্যাঁ, আমার মা আমার সবচেয়ে কাছের। তার সাথে সবকিছু সহভাগিতা করতে পারতাম- শুধু যাজকীয় গোপনীয় বিষয় (যেমন, পাপস্বীকার, ফাদারদের ব্যক্তিগত ও কর্ম-নিয়োগ---) ছাড়া। মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক, ঠিকপথে চলছি কিনা, ভাল-মন্দ, কোথাও যাওয়া, কাউকে সাহায্য, কর্মময় জীবন, দায়িত্ব-কর্তব্য। তাকে আদর্শ মা ও নারী হিসাবে, মা মারীয়ার পরই দেখি। মার কারণে মা মারীয়ার প্রতি ও নারীজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হয়তো বেশি। মার মূর্তি রাখা কি সম্ভব? আমার ঘরে মা মারীয়ার একটি সুন্দর মূর্তি রেখেছি প্রার্থনা করার জন্য।

আমার বাবা প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারীতে মারা যান মাত্র ৫৬ বছর বয়সে। দেখেছি মা ধৈর্য, যত্ন ও বিশ্বস্ততা সহকারে সেবা করেছেন যা সবার কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। অনেকে আমাকে বলে, ফাদার আপনি মার প্রতি অনেক দুর্বল। হ্যা, তাই, এই দুর্বলতা অনেককে মার প্রতি নজর দিতে, যত্ন নিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। অনেক মহান ব্যক্তিগণ নিজ মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসাসহ আদর্শ রেখেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আমাদের ঢাকা সিটি উত্তরের সাবেক মেয়র, আনিসুল হক..।

মার অনেক কষ্ট হয়েছে ছোট ভাইবোনদেরকে মানুষ করতে। আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। জমি বিক্রি অথবা রেহান দেওয়ারও তেমন সুযোগ হয় না। মা কখনও আর্থিক সাহায্যর জন্য কারও কাছে হাত পাতেননি। এতে অনেকে অবাক হয়েছে। আমাদের থাকার ঘরগুলোও ছিল জীর্ণ। মা ভেঙ্গে পড়েননি। মা তার জীবন আদর্শ দিয়ে ৬জনকে ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত করে গেছেন।

মা সিস্টার হতে চেয়েছিলেন। কলিকাতা যাবেন তাও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ছোটবেলায় মা-বাবা কে হারিয়ে তিনি ও তার দুই ভাই অসহায় হয়ে পড়েন। বিয়ের পর, বৃহৎ সংসার সামাল দেন। এক বড় পরিবার, কাজ-এত সন্তান, সব সম্ভব করেছেন তার আদর্শ, ধৈর্য, প্রার্থনা ও পরিশ্রম দ্বারা।

আমি আমার মার উদারতা, সহজ-সরলতা, দেওয়ার আনন্দ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও দান অনুসরণ করছি। মার পাশে ছিলাম সবকিছুতে। মা সর্বদা বলতেন, আরামের জন্য ফাদার হওনি, আমার জন্য কিছু লাগবে না। মণ্ডলীর জন্য ত্যাগস্বীকার ও বিশপের কথামত চলবে। আর্চবিশপ মাইকেল হয়তো ঠিকই উপলব্ধি করেছেন মার প্রতি আমার এই ভালবাসামিশ্রিত বাধ্যতা। তাই বারবার রমনা থেকে বদলি চাইলেও, তিনি তা করেননি। মণ্ডলী ও বিশপকে রক্ষা করার জন্য, অনেক অপবাদ পেয়েছি, অনেকে ঠিকমত না জেনে তা বিশ্বাস করেছে। মা আমাকে বলতেন, থাক, কিছু হবে না। সহ্য করো। তাই, মণ্ডলীর কোন কাজে ইচ্ছাকৃত আমার কোন গাফিলতি ছিল না। বিভিন্ন প্রস্তাব দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি যা সম্মানজনক তা প্রায় ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পরামর্শ নিয়ে 'না' করেছি। মার বাধ্য থাকতে গিয়ে অনেকের অপ্রীতিভাজন হয়েছি।

পরিবারে যেন কোন বিলাসিতা, লোভ-অহংকার অনুপ্রবেশ না করে তার জন্য মার ইচ্ছা পূরণ করতে চেষ্টা করেছি ও আদর্শ রাখতে চেষ্টা করেছি।

মায়ের সম্মানে তেজগাঁয়ে অতি অল্প সময়ে এত মানুষের উপস্থিতিতে উপলব্ধি করেছি যে তিনি মানুষের কত প্রিয় ছিলেন। আমার মা সত্যই দেহে-মনে ছিলেন সুন্দর ও বিশুদ্ধ। অভিভূত হয়ে পড়ি সত্যিই তো মা সবাইকে আপন করে নিয়ে ছিলেন তার মধুমাখা সেবা যত্ন ও ব্যবহারে। রাঙ্গামাটিয়াতে গির্জা ঘর ভরে মাঠ ও রাস্তায়ও মানুষ । কত মানুষের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় আবেগময় কান্না জড়িত কণ্ঠে কথা বলতে হয়। এত অল্পসময়ে অনেকে জেনেও আসতে পারেনি; তেজগাঁও থেকে অনেকে আসতে পারেনি - কিন্তু তারা সবাই সমবেদনা জানিয়েছে, মার ভূমিকার প্রশংসা করেছে।

এমন মার সন্তান হতে পারা বিশেষতঃ বড় সন্তান- তা সত্যিই মহান ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ, মহিমা ও গর্বের কারণ। আমরা ভাগ্যবান মার সন্তান হওয়াতে। তাঁর মৃত্যুতে এ উপলব্ধি ও অনুভূতি আরও গভীরতা পেয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আমার মা-বাবা খ্রিস্টের ইচ্ছাতেই মনোনয়ন পেয়েছেন তারা। আমার মা জাগতিক সম্পদ, অর্থ,স্বাচ্ছন্দ্য চাননি। চেয়েছেন মণ্ডলীর বিস্তার ঐশরাজ্য গঠন। মা মারীয়ার মতই প্রেরিতদের আগলে রাখা ও নির্ভরতা সমর্থন দিয়েছেন মা পরিবারে ও মণ্ডলীর জন্য। মা চেয়েছেন যেন আমি সবাইকে ভালবাসি। সেজন্য আমার ভালবাসার পাত্র-পাত্রী অনেক। কেউ কেউ তা হিংসার চোখে দেখে। মার উপদেশ ছিল, প্রার্থনা করা, সবার সাথে মিলেমিশে থাকা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, মানুষকে কষ্ট না দেওয়া। এসমস্ত কিছুই তিনি জীবনাদর্শ দিয়ে শিখিয়েছেন। যা শিখিয়েছেন, তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন।

মা শান্ত-শিষ্ট অহমিকা বিহীন তেজবিহীন সহজলভ্য একজন নীরব কর্মী। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন সংঘগুলোতে যুক্ত ছিলেন। সেভাবটি হয়তো আমার মধ্যে আছে। সহজলভ্য নীরব কর্মীরূপে সবকিছু করি। সেজন্যই অনেক পরে, আমার নাম রাখা হয় প্রশান্ত যেহেতু একবারে ধীরস্থির, চুপচাপ ছিলাম। নাম, প্রশংসা, বাহবা বা দেখানোর জন্য কিছু করি না। এ বিষয়গুলো আমার চরিত্রের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। আমার মা নীরবে কাজ করেছেন, প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, সহ্য করেছেন-যা এখন ভাবলে অবাক হই-কি করে তা সম্ভব ছিল? মার এই গুণটি আমি পেয়েছি বলে অনেকেই মন্তব্য করে। অনেকেই আমাকে বলেছেন যে আমি নীরবে ঠান্ডা মেজাজে কাজ করি-দেখানো বা প্রচারণার জন্য নয়। এজন্য মানুষের কাছ থেকে সহজেই অনেক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধা-ভালবাসা পাই।

আমার মনে হয় ঈশ্বরপ্রদত্ত আধ্যাত্মিক জীবনে মূলভিত্তি প্রার্থনা, নম্রতা, উদারতা, ভালবাসাপূর্ণ পালকীয়তা, সেবা ও নীরব বিশ্বস্থ কর্মজীবন। আমার মার এ সবই ছিল। তিনি আমার মধ্যে এসবই নীরবে প্রবেশ করিয়েছেন তার জীবন আদর্শ দ্বারা।

মানুষ বর্তমানে নিজ স্বাধীনতায় অন্যদের কথা না ভেবে চলতে চায়। প্রযুক্তি বিদ্যা বা যে কারণেই হোক মণ্ডলীর আইন-কানুনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে। আনুষ্ঠানিকতা বেড়েছে, মানুষ হয়ে উঠছে উৎসবমুখর। পাশেই যে অভাবী-দরিদ্র মানুষ আছে, তা অবজ্ঞা করে। পোষাক পরিচ্ছেদের ছড়াছড়ি, ক্ষমতা ও পদের জন্য লালায়িত, ব্যবসায়িক মনোভাব, নিজ ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া, পছন্দের ব্যক্তিদের নিজ ইচ্ছা বলে পদ দেওয়া, বিদ্বেষ-কলহ-দ্বন্দ্ব, পরস্পরকে অশ্রদ্ধা ও অবহেলা-অবিশ্বাস, সমালোচনা রটনা, তর্ক-বিতর্ক, হানাহানি, ঝগড়া-ঝাটি, অর্থপাচার ও চুরি, দুর্নীতি, বাহ্যিকতার আড়ম্বরতা, নিজ প্রশংসার কাঙ্গাল-এসবই সমাজে দানা বেঁধে উঠছে। সামাজিক কর্মকা- বিরোধ-দলাদলি দৃশ্যমান। সেইসাথে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজকে ঘিরে ধরেছে। কারো কথা কেউ শুনতে ও গ্রহণ করতে চায় না। কর্তৃপক্ষকে মানে না, আমাদের ব্যর্থতা আছে, তবে, সদিচ্ছারও অভাব নেই কিন্তু বাস্তবায়নে বাধা অনুভব করে। কেউ এগিয়ে আসতে চাইলে, উদ্যোগ নিলে অপব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ফলে, ব্যক্তি নিরাশ হয়ে দৃশ্যপট থেকে সরে আসে। যিশুর নম্রতা, ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা ও পরিশ্রম আমরা স্মরণ করতে চাই না।

আমার মা রত্নাগর্ভা হয়েছেন, তা গর্বের ও আনন্দের তবে সেটা বড় কথা নয়। তিনি প্রার্থনাশীল ও ধর্মপ্রাণ, নম্র-ভদ্র নীরব পরিশ্রমী, উদার অতিথিপরায়ণ ও ঈশ্বর ভক্তিময়। এমন মার সন্তান হয়ে আমি অনেক গর্বিত, তাও আবার বড়ছেলে। আমার মার আদর্শগুলো আমি অর্জন করতে চেষ্টা করেছি। একবার আমি মার সাথে রাগ করেছি ফোনে, লাইন কেটে দিয়েছিলাম। মা একটু পরেই ফোন করে কেঁদে কেঁদে বললেন, "আমারই দোষ। তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়েছি। আমি অনেক দুঃখিত, ক্ষমা করো।" আমি তো অবাক। নম্রতার কত বড় নিদর্শন! আমি সিদ্ধান্ত নিই আমিও নম্রভাবে অন্যকে শ্রদ্ধা-সম্মান ও মূল্য দিবো। তবে তা দিতে গিয়ে আমি হিংসার শিকার হয়েছি-দুর্নামও হজম করেছি। তাদের আমি ক্ষমা করি। আমার অপরাধ ও ভুলের জন্য বারবার ক্ষমা চাইতে পারব। এমনিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য ক্ষমা চাইতেও আমার লজ্জা নেই। এগুনটি মার কাছ থেকে পেয়েছি। ৭ম শ্রেনীতে আমি ৫ নম্বরের ব্যবধানে ৩য় হই। ১ম হতে পারিনি, ২০ মার্ক আমার মোট নম্বরে যোগ করতে ভুল করেছেন শিক্ষক। এটা আমি প্রতিবাদ করিনি। আমার মা এজন্য কেঁদেছেন।

আমার মা জীবন্ত সাধ্বী। এরচেয়ে ভাল ও আদর্শ মা এ জগতে সম্ভব কিনা তা আমার বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধ্যানে আসে না। আমার মা কেন এত ভাল! কিন্তু কিছু মানুষ তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, অপমান করেছে। এসব নীরবে সহ্য করেছেন, ক্ষমা করেছেন সবাইকে। আমি বিশ্বাস করি না যে আমার মাকে পাপের কোন কলুষতা কোনভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে।

মার্থা ও মারীয়ার ভূমিকায় মা আমার সমুজ্জ্বল। হ্যাঁ, খুজে বের করা হয় সাধু-সাধ্বীদের। আমাদের মার বেলায় তা নাও হতে পারে। ধন্য এই মাতৃগর্ভ! দশটি সুমিষ্ট ফল দান করেছেন জগতকে। তিনি শুধু আমাদের মা নন। তিনি সবারই মা। অনেকেই তাকে মা বলে ডাকতো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার যথার্থ ভাষা আমার জানা নেই। ঈশ্বরকে প্রশ্ন করি, কেন তিনি এত আদর্শ, পুণ্যময়ী পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত নারীকে এ জগতে পাঠালেন? মার সম্বন্ধে স্তব বা লিতানি করা সম্ভব।

আমার মা সবারই মা। তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীর সকল ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও বিশ্বাসীদের মা। মা মারীয়া ছিলেন শিষ্যদের আশ্রয়স্থল -আমাদের মার ভূমিকা অনেকটা তা-ই। তিনি সিস্টার হননি, কিন্তু সব মেয়েকেই দিয়েছিলেন সিস্টার হওয়ার জন্য এবং সন্ন্যাস ব্রতগুলো তিনি নেননি, কিন্তু তার জীবন প্রমাণ করে তিনি কত বড় সন্ন্যাসীনি। বিশ্বস্থ, সহজ-সরল-দরিদ্র জীবনযাপনে অভ্যস্ত মার ছিল না চাওয়া-পাওয়া-হারানোর কিছু। এই না চাওয়াই তাকে দিয়েছে পূর্ণতা ও পবিত্রতা। বাড়ীর দালান নয়, স্বর্গের দালানে তার বসবাস। প্রতিদিন মিসায় শেষ প্রার্থনার আগে নীরবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এমন মার জন্য এবং মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। ■

মায়ের পদতলে সন্তানের স্বর্গ

জয় আন্তনী রোজারিও

"মা" শব্দটি সত্যি মহান। সন্তানের জীবনে মায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তান সর্বপ্রথম যে শব্দটি শেখে তা হলো 'মা'। মা নামটির আড়ালে লুকিয়ে আছে মায়া, মমতা আদর ও ভালবাসা। মায়ের কষ্ট, ধৈর্য ও সাধনা আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের ভিত্তি। মা আমাদের ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারণ করেছেন। শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও আমাদের আগলে রেখেছেন। মায়ের কারণেই আমরা এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখতে পেরেছি। মায়ের এক ফোটা দুধের মূল্য কোটি কোটি টাকা দিয়েও পরিশোধ করতে পারব না। সন্তান যখন ছোট থাকে, মা নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে সবসময় সন্তানের সুখের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। কিন্তু আমরা অনেক সময় শেকড়ের আশ্রয়দাতা অঙ্কুরের মূলকে ভুলে যাই। অনেক সময় ভুলে যাই মা আমাদের নরম দেহটিকে শক্ত পৃথিবী থেকে রক্ষা করে আমাদের যুদ্ধের কৌশল শিখিয়েছেন। তাঁর ফলেই আজ আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে।

মায়ের কাছে সন্তান সবসময় শিশুসুলভ। প্রকৃতপক্ষে মা নিজের জীবনের চেয়ে সন্তানের জীবনের মূল্য বেশি দেন। তাই মা সারাজীবন সন্তানকে বুকে জড়িত রাখেন। মা নিজে না খেয়ে নিজের খাবার সন্তানের মুখে তুলে দেন, নিজে ভালো কাপড় না কিনে সন্তানকে ভালো কাপড় কিনে দেন এমনও শত ত্যাগস্বীকারের সমাহার আমরা মায়ের জীবনে দেখতে পাই। সন্তানের প্রতি মায়ের এই যে মায়া - মমতা, তা স্বর্গীয়। সন্তানের জীবনে মা আর্শীবাদস্বরুপ। মা একজন সুস্থ সবল সন্তানকে যতটা ভালোবাসেন, স্নেহ করেন ঠিক ততখানি একজন অসুস্থ প্রতিবন্ধী সন্তানকে ভালোবাসেন ও স্নেহ করেন। উদাহরণস্বরুপ- ঢাকাতে এক মা তাঁর ছোট ছেলে ও প্রতিবন্ধী মেয়েকে নিয়ে বাস করেন। খ্রিষ্টান এ মা সংসারের সমস্ত কাজ, নিজের পড়াশুনা করেও প্রতিবন্ধী মেয়েটার এতটুকু অযত্ন করেনি। মেয়েটি শুধু স্পর্শ বুঝতে পারত, কণ্ঠ শুনে উপলব্ধি করতে পারত কে এসেছে। তাকে স্পর্শ করলে তার মুখে হাসি ফুটে উঠত। প্রায় আঠারোটি বছর মা এই প্রতিবন্ধী মেয়েকে লালন-পালন করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কোন অভিযোগ নেই, রাগ নেই। মেয়েকে আর একটু ভালো করার আশায় মা মেয়েটিকে উন্নত চিকিৎসা করার জন্য বিদেশ নিয়ে যান। হাসপাতালে একমাস থাকতে হয়। 'মা' যেহেতু মেয়েকে ছাড়া কখনও ঘুমাননি তাই হাসপাতালেও মা মেয়ের সাথে ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসার স্বার্থে ডাক্তারগণ মাকে আর থাকতে দিলেন না। এক সপ্তাহ পর মেয়েটি মারা যায়। ডাক্তারগণ বললেন 'মেয়েটি ওর অসুস্থতার জন্য মারা যায় নি মারা গেছে হার্টফেল করে।' অর্থাৎ মাকে কাছে না পেয়ে !.....মা ছাড়া সন্তান অসহায়।

সুতরাং আমরা দেখি মা সারাজীবন সন্তানের জন্য ত্যাগস্বীকার করেই যান। কিন্তু আমাদের ভাবা উচিত আমরা মায়ের জন্য কতটুকু করছি? মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন আমাদের পবিত্রতম দায়িত্ব। তাই আমাদের কর্তব্য মায়ের কথামতো চলা ও কষ্ট করে হলেও মায়ের আশা পূরণ করা। তাতে জীবনে নিজেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, মায়ের জীবনে সুখ আসে। কিন্তু বাস্তবতায় আমরা কী দেখতে পাই ? দেখতে পাই, বৃদ্ধ বয়সে মাকে হতে হচ্ছে শত কষ্টের সম্মুখীন। মাকে পথে নামতে হচ্ছে একমুঠো খাবারের জন্য। আমাদের বুঝা উচিত বৃদ্ধাবস্থায় মা শিশুর মতো শক্তিহীন, দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক ছোট বেলাতে আমরা যেমন থাকি। তাই এমন অবস্থায় তাদের প্রতি আমাদের সেবা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা উচিত। মায়ের ঠিকমত খোঁজখবর নেওয়া, যত্ন করা আমাদের সমস্ত কর্তব্যের শীর্ষ কর্তব্য। এই কর্তব্য এমন মানবিক কর্তব্য যে, একে উপেক্ষা করলে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারে না।

একদিন একটি শিশু ঘরের ভিতর বল দিয়ে খেলা করছিল। খেলা করার সময় হঠাৎ বলটি গিয়ে মায়ের ছবির ফ্রেমে লাগে এবং তা নিচে পড়ে ভেঙ্গে যায়। শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে বাবা এসে দেখে ছেলে তার মৃত মায়ের ছবি বুকে জড়িয়ে নিয়ে অজোরে কান্না করছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যাদের মা নেই তারা কতটুকু কষ্টে আছে, একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারে মায়ের গুরুত্ব। কারণ, একটা সন্তানের জীবনে মায়ের চেয়ে বড় বন্ধু, বড় শিক্ষক আর নেই। মায়ের কাছ থেকে সন্তান আদর্শ, নীতি , নৈতিকতা, ধর্ম, আচার-আচরণ শিক্ষা লাভ করে এবং সেগুলো জীবন গড়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগায়। তাই আমাদের যতটুকু সম্ভব মাকে সময় দেওয়া উচিত। তাঁর সকল চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় আমাদের সচ্ছলতা থাকে না, তাই বলে মাকে অবহেলা করা উচিত নয়। মা আমাদের সুখ-দুঃখ বোঝেন। তাই আমাদের উচিত মায়ের সাথে সংসারের সুখ-দুখ ভাগাভাগি করে নেওয়া। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মে মায়ের গুরুত্ব সবার উপরে দেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে ঋণশোধের উপায় হিসেবে নয় বরং সেবার মনোভাবকে উচ্চাসনে বসাতে। আমরা কখনো মায়ের দানের প্রতিদান দিতে পারব না। তাই আমরা মায়ের কাছে চিরঋণী। এ ঋণ কখনো শোধ হবার নয়। মাকে সবসময় সন্তুষ্ট রাখাতে পরম সুখ। তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। তবেই মানব জনম সার্থক হবে এবং আমরা প্রকৃত স্বর্গ খুঁজে পাবো।।

এখন সবকিছু লণ্ডভণ্ড

এলড্রিক বিশ্বাস

লকডাউনে বাংলাদেশে সব যখন
লণ্ডভণ্ড
এ সময়ে অনেকে দেখাচ্ছে নানা কাণ্ড,
সাহায্যের আশায় অসহায়রা হাতে
নিয়েছে ভাণ্ড
চাল, তেল চোরেরা হয়েছে সমাজে
ভণ্ড।

এসো মানবতার তরে ঝাঁপিয়ে পড়ি
মানুষের জন্য সামর্থ নিয়ে কিছু করি,
এই দুর্যোগে আমরা যেন পেট না ভরি
স্বাস্থ্য কর্মীরা নিবেদিত যাঁরা বলছে না
মরি।

নিয়ম মেনে, লকডাউন মেনে ঘরে
থাকো
এই সময়ের অভিজ্ঞতা জীবনে পাবে
নাকো,
কারা বের হয়েছে, এই সময়ে সেবা ও
শ্রম দিয়েছে
তাঁরা স্বাস্থ্য কর্মী, আইন রক্ষাকারী
বাহিনী, তাঁরা নয়কো ভীত।

মা

লিলি ফিলোমিনা

মা কথাটি ছোট্ট অতি, কিন্তু জেনো ভাই, ইহার চেয়ে নাম যে মধুর ত্রি ভূবনে নাই ।

প্রকৃতির একটি অনন্য সৃষ্টি মা । ভাবুন তো মা না থাকলে পৃথিবীটা কেমন হতো ? এই পৃথিবী কি তার অপার সৌন্দর্য হারাতো না ? প্রাণীকূলের প্রত্যেকের স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে নিজ নিজ মাতৃজঠরকে সম্মান করা ও মা'কে রক্ষা করা উচিত ।

একটি অত্যন্তচমকপ্রদ ও অতি প্রাকৃত বিষয় হলো এই যে, পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাষার মধ্যে মা বা জননীকে ডাকতে সন্তানেরা যে শব্দটি ব্যবহার করেন সেই শব্দটি হচ্ছে "ম" । ইংরেজিতে Mother এর শুরুতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা ও M দিয়ে । অর্থাৎ পৃথিবীর আদি, অকৃত্রিম খাঁটি ও অলৌকিক যদি কোন শব্দ থাকে, তবে তা 'মা' । সকল প্রাণীকুলের জন্য অত্যাবশ্যকীয়; ঈশ্বরের বড় দান হলো মা । যা কোন ভাবেই পরিবর্তনীয় নয় । যার কোন বিকল্প নেই, পরিমাপক নেই । মায়ের দুধে পৃথিবীর সমস্ত পুষ্টিগুণ বিদ্যমান । রূঢ় এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রথম আমরা যে খাবার গ্রহণ করি তা' মায়ের দুধ । নির্ভেজাল, খাঁটি খাবার । যে খাবার আমাদেরকে দাম দিয়ে কিনতে হয় না । মায়ের নাড়ি ছেঁড়া ধন সন্তানকে মা পরম মমতায় দুগ্ধপান করায় ।

প্রাকৃতিক বিরল গুণের অধিকারী মা তার আঁচলে সন্তানকে সুরক্ষিত রাখেন । বিপুল বিশাল এই পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানতে পারি । পৃথিবীকে যদি আমরা মা মনে করি, তবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী হবে আমাদের সহোদর । বিনা প্রয়োজনে আমরা কোন সহোদরকে হননে ব্যাপৃত হবো না । পৃথিবী যেমন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে. ঠিক তেমনি পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রতিটি প্রাণীর উচিত পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রেখে নিজেকে রক্ষা করা ও প্রকৃতিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা ।

পৃথিবীতে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অথচ পৃথিবী পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছে । মানব সভ্যতা ও প্রযুক্তির নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে । সমস্ত পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও শান্তির বারতা নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমন করছে বর্বর , আদিম পন্থায় । নারীকে দাস ও

ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে আজ অবধি । জীবন ধারনের জন্য নুন্যতম চাহিদাগুলি পূরণ করতে গিয়ে মানুষ, অমানুষে পরিণত হচ্ছে । প্রকৃতি কিন্তু উদার হস্ত প্রসারিত করে আমাদেরকে একটার পর একটা উপহার দিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু আমরা মানুষ নিজস্ব জ্ঞান গরিমা ও অহংকারে প্রকৃতির দেয়া উপহার নিয়ে উপহাস করছি, পায়ে দলে, ফুলের সৌন্দর্য নিংড়ে ছিবড়ে করে ফেলে দিচ্ছি ।

বর্তমান জগতে যা' কিছু সংঘটিত হচ্ছে তা'র জন্য সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ করে লাভ নেই । সবই মনুষ্যসৃষ্ট । ঈশ্বর মানুষের মধ্য দিয়েই কাজ করেন । জগতে প্রাকৃতিক যা' কিছু আছে তা'র যথার্থ ব্যবহার, সংরক্ষণ আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে । আর অপব্যবহার আমাদেরকে ধ্বংস করবে । একটি পরিবার গঠিত হয় মা,বাবা ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে । বাবা ও মা দুজন সংসারের ভার সমানভাবে বহন করেন । কিন্তু বাবা যদি মনে করেন যে, মা কার্যত কোন কাজই করেন না, সংসারে তা'র কোন মূল্যই নেই, বোঝা স্বরূপ, তাহলে সেই সংসার-এ অচলাবস্থা, সমন্বয়হীনতা, সন্তানের আচরণ খারাপ হতে বাধ্য । কারণ অসম (Imbalanced) অবস্থানে আমরা কেউই ভালো থাকতে পারি না ।

সন্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধুমাত্র পিতামাতাকে নয় বরং সমাজকে নিতে হবে । মা' সংসারে পদার্পণের পর হতে কখনোই ছুটি কাটায় না । অথচ বাবার অফিস ছুটি হয়, শিশুদের স্কুল ছুটি হয় আর কাজের বুয়াও নানা তাল-বাহানায় অনুপস্থিত থাকে । কিন্তু মা পরম মমতায় সংসার আগলে রাখে, ঝড়, বর্ষা, বাদলে কিংবা কনকনে শীতে । মায়ের এই ঐশরিক ভালবাসা, অমানুষিক পরিশ্রম, আন্তরিকতার স্বীকৃতি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন প্রকৃত পক্ষে জগতের কল্যাণ হবে ।

প্রতিটি বাবা-মায়ের অবশ্য কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদেরকে বিশেষ করে কণ্যা সন্তানদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা । কারন একজন শিক্ষিত মা, একটি শিক্ষিত জাতির জন্ম দিতে পারে ।

যিশুর মাতা হিসেবে মা মারীয়া যিশুকে সদুপোদেশ দিয়েছিলেন সকলের বাধ্য হয়ে চলতে । যিশু ঈশ্বর পুত্র হয়েও মায়ের আদেশ পালন করে বিয়ে বাড়ীতে জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেছিলেন । একজন খ্রিস্টান মা হিসেবে, প্রতিটি সন্তানকে সময়মত পড়াশুনায় সাহায্য করা যেমন জরুরী, ঠিক তেমনি প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করাও গুরুত্বপূর্ণ ।

পৃথিবীতে সকল মা' সুখী হোক সন্তানদের ভালবাসায় ও সম্মানে এবং স্বামীর একনিষ্ঠ ভালবাসায় - এই কামনা করি ।

বিশ্ব মা দিবসের যত কথা

পিউস পি গমেজ

মা একটি ছোট শব্দ। এই একটি শব্দের মাঝে পৃথিবীর সকল মধু যেন মেখে রয়েছে। মায়ের মতন এমন আদর সোহাগ আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর মুখ দর্শনে সকল দুঃখ বেদনা ভুলে যাই। মায়ের শীতল কোলেতে শুয়ে ঘুমালে হৃদয় অন্তর জুড়িয়ে যায়। পাঠশালা থেকে বাড়ী ফিরলে মা কোলে তুলে নিয়ে আদর করে খাওয়ান। এই আদর সোহাগ পর্ব কত না আপন। সন্তান ভালো লেখাপড়া করলে মা বেশী খুশি হন। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে মায়ের ভাবনার শেষ থাকে না। মায়ের আর্শীবাদ পেলে সন্তানের সকল দুঃখ-বেদনা দূর হয়। যা খুবই স্বাভাবিক এবং সবচেয়ে কাছের মানুষই মা।

সন্তানের ভাল-মন্দ কিছু একটা হলে, আগেই মা জেনে যায়। মাকে কখনো ভুলে যাওয়া যায় না এবং দুঃখ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। মায়ের স্নেহ-মমতা জীবন চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা গভীর মমতায় লালন করেন। জীবন চলার পথে সন্তান সাফল্যমণ্ডিত হতে পারলে মা সবার আগে বেশী খুশি হয়। অন্যদিকে মায়ের আশীষ পেলে সন্তানের দুঃখ ঘুচে যায়। সন্তানের জন্যে মা একটি শ্রেষ্ঠ আর্শীবাদ। মায়ের ছোঁয়া পেলে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সুখে পরিনত হয়। শীতের সকালে হাতে তুলে দেওয়া একটা কমলালেবু এবং গ্রীষ্মের দুপুরে একটা আম তুলে দেওয়ার মায়ের এই অবদান কখনো ভুলা যায় না। মা, আমাকে জন্ম দিয়ে পৃথিবী দর্শন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি, আমার জন্মদাত্রী মায়ের চোখ দিয়ে পৃথীবির অপরুপ সৌন্দর্য উপভোগ করি। অতএব, মা আমার চোখের মনি। মায়ের তুলনা মা নিজেই। বিশ্ব প্রকৃতির প্রধান মধুর শব্দটি 'মা'। একটি শিশুর যখন জন্ম হয়, ধীরে ধীরে সে মায়ের কাছ থেকে কথা বলতে শিখে আর তাঁর প্রথম শেখার বর্ণ বা অক্ষরটি 'মা'। সন্তানের মুখের মা ডাক শুনার জন্য মা প্রথম থেকেই দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকে। সন্তানের মুখে মা ডাক শুনে আনন্দের জোয়ার উঠে। সন্তানের কাছ থেকে মার বিশাল পাওয়ার এই 'ডাক' পৃথিবীর অপরুপ সৌন্দর্য যাই দেখতে পাই শুধু মার কারণে। মার জন্যই এই ধরণীর সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারি।

মা, যদি সন্তান জন্ম না দিতো তবে এই সুন্দর পৃথিবীর সৌন্দর্য প্রশংসা করার মানুষের অভাব হত। আমি যখন কোলে ছিলাম, মা তুমি বসতে শিখিয়েছ। আমি যখন বসতে শিখেছি, তুমি আমাকে দাঁড়াতে শিখিয়েছ। এই ভাবে দিনে দিনে ক্রমাগত ভাবে আমার পরিচর্যা করে চলেছ। মা, আমি আজও তোমার চোখের মনি দ্বারা পৃথিবীর বন্ধুর পথে এগিয়ে চলেছি। একদিন সাফল্য পাবই। সকল সন্তানের রক্ষা কর্তাই মা। আমার জীবনে মা তুমিই 'নয়ন মনি'। মা এবং মা দিবস পৃথিবী জুড়ে উদ্‌যাপন হয়ে চলেছে। মা চলন্ত এক গাড়ী। মা দিবস সৃষ্টির গল্প কাহিনী অনেক। মা দিবস সৃষ্টির প্রতিষ্ঠাতা মা তুমি নিজেই।

এই দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রচলন শুরু করেন আমেরিকার অ্যানা মেরী জার্ভিস নামক এক মহিয়সী নারী। এই সুনামধন্য মহিয়সী মা অ্যানা মেরী জার্ভিস শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মী ছিলেন। এই মহিয়সী নারী সমাজে অনেক অবদান রাখেন। ৯ মে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ তিনি প্রভুতে নিদ্রিত হবার পর তার কণ্যা তার এবং বিশ্ব সকল মাকে সম্মানিত করার অভিপ্রায়ে 'মা দিবস' পালনের এক কর্ম পরিকল্পনা এবং মহৎ একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর অনেক দেশের মত আমেরিকাতেও মায়েরা অবহেলার শিকার ছিলেন।

এই নারী ১২ মে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপ্টিস্ট মিশন সেন্ট এনড্রুস মেমোরিস্ট চার্চে এক উপসনার আয়োজন করেন। অনেক বর্ণের পাপড়ি দিয়ে প্রকৃতির মৃদু সমীরণে অথিতিদের বরণ করেন। কোন এক সময় এই উৎকণ্ঠিত নারী পশ্চিম ভার্জিনিয়ার শহরে মায়ের স্মরণ উপযোগী একটা গির্জা নির্মাণ করেন। জাতীয় মর্যাদায় 'মা দিবস' পালন করার জন্য ও সরকারী ছুটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনীতিবিদ ও সমাজকল্যাণ বিভাগের সরকারী মন্ত্রণালয়ে উদার ভাবে কথা বলেন এবং একটা স্মারকলিপি অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। তারপর ওয়াশিংটনে ডিসির শহরের মানুষের কাছে ঘরে ঘরে গিয়ে 'মা দিবস' পালনের কথা ব্যক্ত করেন।

এই শহরের অধিকাংশ মানুষই তা সমর্থন করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এ- উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রোববার জাতীয় ভাবে 'মা দিবস' পালন করার জন্য অনুমতি দান এবং ছুটি ঘোষণা করেন। সেই দিন থেকে আমেরিকার সাধারন জনগণ মে মাসের দ্বিতীয় রোবব-ার মা দিবস অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করে আসছে। এই মহিয়সী নারীর পথ আঁকড়ে ধরেই বিশ্বের অধিকাংশ দেশসমূহ মে মাসে আনন্দের সাথে মা দিবস যথার্থ ভাবে পালন করে।

বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা ব্যাকরণ, চলচিত্র শিল্প ও পালাগানের ইতিহাসে মাতৃ বন্দনার সমাহার । কতজনে নীড় হারা পাখীর মত, মা হারার বেদনা-ক্রন্দনে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে চলেছে। আমাদের বঙ্গ নারীর গর্ব যে, তার সন্তানের সঙ্গে নাড়ীর টান অনেক । এবং মায়ের দুধের ঋন কোন সন্তানই পরিশোধ করতে পারে না।

সন্তান জন্মদানের মধ্যে দিয়েই এক নারী মা হয়ে ওঠেন। ধরণীর বুকে মা হওয়ার আনন্দ গৌরব অর্জনে নারীদের এক বিশেষ সাফল্য। জন্মদানের নারী নব জীবনের মাতৃত্বের সার্থকতা লাভ করেন। শিশুদের প্রকৃত স্থান মাতৃক্রোড়ে। মায়ের কোলে শিশুকে যেমন সুন্দর মানায়, অন্যের কোলে তেমন মানায় না। মায়ের তুলনা শুধু মা। মা আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমার চোখের মনি। সত্যি! মা তুমি অনন্যা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বাংলা ব্যাকরণ ও বিশ্ব ইতিহাস।

আমার মা আমার অহংকার

দীপক সাংমা

পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর ও প্রিয় শব্দটি হল 'মা'। কোন কিছুর সাথেই মায়ের তুলনা হয় না। আমার মা, সবার মা, মা-তো মা-ই। মা ছাড়া পৃথিবী শব্দটি অর্থহীন। একবাক্যে মা-মাটি-মানুষ। মাটি যেমন বীজ বক্ষে লালিত করে অঙ্কুর উদ্গীরণের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে বিশাল গাছ ও প্রকৃতির উপহার দেয় একইভাবে মা-ও দশ মাস দশদিন গর্ভে লালন করে সন্তানের জন্ম দেয়। এতেই শেষ নয় শিশু থেকে যতদিন পর্যন্ত সন্তান নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে ততদিন পর্যন্ত মা দায়িত্ব থেকে সড়ে দাঁড়ায় না। স্নেহের দিক দিয়ে সন্তান যতই মোটাসোটা হোক না কেন বাড়ী ফেরার পর সন্তানকে দেখে মা বলে, 'ইস্ বাবা তুমি কত শুকিয়ে গেছ।' খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করোনি। আমাদের জীবনে মায়ের যে ভূমিকা রয়েছে তা কোন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

স্মৃতিপটে প্রতিনিয়তই মায়ের ছবিগুলো ভেসে ওঠে। সে স্মৃতিগুলো শুধু কাঁদায়, অনুপ্রেরণা যোগায়, সংসারে চলার গতি বাড়ায়। মায়ের সাথে সেই স্মৃতিময় দিনগুলোর কিছু কথা তুলে ধরছি।

ছোটবেলা বাবাকে খুব বেশী কাছে পাইনি। অভাবের সংসারে বাবা চাকরীর সুবাদে দুইমাস বা তিনমাস পর বাড়ি আসত দু'এক সপ্তাহের জন্য। তাই মা-ই ছিল আমার সুখে-দুঃখের বন্ধু, খেলার সাথী ও পথ প্রদর্শক। আমার প্রায় এগারো বছর পর আমার ছোটভাইয়ের জন্ম। এই ছিল আমাদের সংসার। আমি তখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। মা খুব শিক্ষিত ছিল না। হাতে-খড়ি নিজের স্বাক্ষর করতে পারে এবং খুব কষ্টে দুই-তিন বার বানান করে সে সময়ের গোলাপী রঙের মলাঠের বই নাম 'বাল্যশিক্ষা' বইটি পড়তো। বানান করতে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গে যেত তাতেই কি! সেই বাল্যশিক্ষা বইটির সব কবিতাগুলো মুখস্থ বলতে পারতো। শুদ্ধ উচ্চারণ এবং সুরেলা কণ্ঠে কবিতাগুলো আওড়িয়ে আমাকেও শিখাতেন যদিও আমার ক্লাশের পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কিছু কিছু কবিতার অস্পষ্ট দু'লাইন এখনও মনে পড়ে– "পাখি সব করে রব রাত্রি পোহাইলো, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল" "ঘোড়ায় ছড়িল আচার খাইল, পরিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলো।"

প্রতিদিন মা সন্ধ্যায় আমার ক্লাশের পড়া হোমওয়ার্কগুলো করাতো। অভাবের সংসারে তখন চেয়ার টেবিল ছিল না। চটের বস্তা ভাঁজ করে বইখাতা নিয়ে সেখানেই উবুর হয়ে পড়তাম। পাশেই মা কি যেন সেলাই করতো। আমাকে বলতো আজকের ক্লাশের পড়াগুলো বের করো এবং সবগুলো পড়া আমাকে দিতে হবে। বলতাম মা খিদে পেয়েছে, বেশতো পড়াগুলো তাড়াতাড়ি দাও; তো খেতে পারবে। ক্ষুধার জ্বালায় ইচ্ছা-অনিচ্ছা সত্বেও পড়াগুলো শেষ করে বলতাম, মা নাও- পড়া ধরো। কবিতা, রিডিং, প্যারাগ্রাফ, বানান সব ঠিকমত দিয়ে দিতাম। মা, এবার তাহলে শেষ। ভাত দাও, মা না! অংক আছে। ছেলের কষ্ট দেখে মায়ের মনে একটু সোহাগ জন্মাতো। আচ্ছা তাহলে কালকে খুব সকালে উঠে অংকটা শেষ করবি। সকালে পড়তে বসলে নাকি ব্রেইন খুব সার্ভ থাকে, মা বলতো। এভাবেই মায়ের কাছে আমাদের হাতে-খড়ি। বড় হয়ে এখন বুঝতে পারি আমার ক্লাশের পড়াগুলো মা পড়তে পারতেন না এবং লিখতেও পারতেন না। কিন্তু কি-যে একটা সিষ্টেম তৈরি করেছিল সে সময়ের শিশুমনে তখন বুঝার ক্ষমতা ছিল না। সে সময় জানতাম মা আমার অনেক শিক্ষিত স্কুলের পন্ডিত স্যারের মতো। না মা তুমি আমার অহংকার, তুমি আমার রত্নগর্ভা মা। মা তুমি অশিক্ষিত নও, তুমি আমার কাছে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী, ইউনিভার্সিটির বড় শিক্ষক - তাইতো আজ তোমার এক ছেলে ফার্ষ্টক্লাশ গেজেটেড অফিসার। মা তোমার কোন তুলনা হয় না। তোমাকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম, তুমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মহিয়সী নারী। এই মহান মা দিবসে আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ এওয়ার্ড ঘোষণা করলাম।

তখন আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। মা ছোটবেলা একটি গান শিখিয়েছিলেন। 'মায়ের মত আপন কেহ নাইরে, মা জননী নাইরে যাহার ত্রিভূবনে তাহার কেহ নাই নাইরে'। গানটি বাজনা ছাড়া সুন্দর করে মার সাথে সাথে গাইতাম। অন্যকোন গান খুব বেশী গাইতে পারতাম না। স্কুলের এক অনুষ্ঠানে সহপাঠী চন্দন আমাকে লজ্জায় ফেলার জন্য আমার নাম ঘোষণা করে, আমাদের এখন একটি গান পরিবেশন করবেন ক্লাশের মেধাবী ও ভদ্র ছাত্র দী-প-ক। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পুরোহিত ও সিস্টারগণ সবাই এদিক ওদিক তাকিয়ে আছে। আমার তো আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়ার মতো অবস্থা। দুই পা কাঁপতে শুরু করলো। জোর করে উঠিয়ে দিল মঞ্চে। মায়ের কথা মনে পড়লো। মা কোন একদিন বলেছিলেন, তোমাকে কেউ যদি কোন অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলে তবে তুমি এই গানটি গেয়ো। ভয় পাবানা। মঞ্চে উঠে সামনের সারিতে না তাকিয়ে দূরে বা রেডি হয়ে চোখ বন্ধ করে গাইবা। যে কথা সে কাজ। মঞ্চে উঠে সামনের সাড়িতে তাকাতেই দেখি দুষ্ঠু ছেলেরা চন্দন, বিমল, সেতারাম সবাই কেমন জানি মুখ ও হাত অঙ্গ-ভঙ্গি করে শব্দ না করে হুক্কা-হুয়ার ডাক তোলছে। তাদের দিকে তাকাতেই হাসি রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু কি আর করার আছে। মা-ই আমার ভরসা তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে শুরু করলাম 'মায়ের মতো আপন কেহ নাই রে, মা জননী নাইরে যাহার, ত্রিভূবনে তাহার কেহ নাই নাইরে...।' তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন সন্তুষ স্যার, হারমোনিয়ামে শিলনী দিদি। গান শেষে টিনের বেড়া স্কুলঘরটি করতালিতে যেন কেঁপে উঠছিল। পাশেই বসা ধূতি পড়া পন্ডিত স্যার ধূতির আঁচল দিয়ে চোখ মুচছিলেন। পড়ে জানলাম গান শুনে স্যারের মায়ের কথা মনে পড়ায় কাঁদছিলেন। সেবার আমি স্কুলের সঙ্গীতে প্রথম হয়েছিলাম এবং পুরস্কার পেয়েছিলাম একটি গোলাপী রংয়ের লাক্স সাবান। অনুষ্ঠান শেষে মাকে গিয়ে বলি, 'মা আমি একটি গান গেয়ে পুরস্কার পেয়েছি। এই নাও। মা জিজ্ঞেস করে কেঁদেছিল। ঐ গানটা গেয়েছিলে না। হয় মা'। পরে পুরস্কারের ঐ সাবানটি যত্ন সহকারে ব্যবহার না করে ট্রাংকের ভিতর রেখেছিল প্রায় দু'বছর তারপর আর কৌতূহল জাগে নি। মার স্মৃতিকথা বলে ও লিখে শেষ করার মত নয় অনেক স্মৃতিই নীরবে শুধুই কাঁদায়। মা তুমি তূলনাহীনা, মহিয়সী, শিক্ষাগুরু, জীবন সুখময় ও আমার পথ প্রদর্শক। তোমাকে ধন্যবাদ ও প্রণাম করি। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুক।

করোনা ভয় আমরা অচিরেই করবো জয়

ড. আলো ডি'রোজারিও

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করোনা ভাইরাসের হাত হতে রক্ষা পেতে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ ক্রমান্বয়ে গৃহে অবস্থান করছেন স্বইচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে। বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের গৃহ নেই তারা থাকছেন কোথায়? ইতালীর রাজধানী রোমে এক পুলিশ রাস্তায় হাঁটাচলারত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে পরামর্শ দিলেন গৃহের ভেতরে যেতে। ঐ ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'রাস্তাই আমার গৃহ'। বিষয়টা সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের পর দেখা গেল, ইতালীর অনেক বড় বড় খালি হোটেলে রাস্তার মানুষের ঠাঁই মিললো যেন তাদের কারো রাস্তায় থাকতে না হয়।

এই ভাইরাস হতে সুরক্ষার একটি ভালো উপায়, বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। কোন কোন শরণার্থী শিবিরে যেখানে এক হাজার মানুষের জন্য একটি মাত্র পানির ট্যাপ, তারা বারবার হাত ধুবেন কীভাবে? আফ্রিকার কোন কোন দেশে যারা এক কলসী পানি সংগ্রহ করতে ১০ বা ২০ মাইলের বেশী হাঁটেন, তারা হাত ধোয়ার জন্য এত পানি পাবেন কোথায়? এবারও এই সমস্যাটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে অনেকের নজরে আসার সাথে সাথেই উদ্যোগ নেয়া হলো বাড়তি পানি যোগানের, বিশেষ করে শরণার্থী শিবিরগুলোতে করা হলো বাড়তি পানির ব্যবস্থা।

প্রশাসনের ঘোষণাকৃত গৃহের অভ্যন্তরে থাকার নিয়ম ভেঙ্গে নদীতে গিয়ে চিংড়ির পোনাধরারত এক জেলেবোনকে এক সাংবাদিক ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি চিংড়িপোনা ধরতে ঘরের বাইরে আসলেন কেন?' 'না এসে কী উপায় আছে আমার, নয় জনের সংসার, যে খাবার পেয়েছি তা তো চার দিনেই শেষ হয়ে যাবে, বাকী ছয় দিন খাব কী?', বাগেরহাট জেলার এক জেলেবোন উত্তর দিলেন। তার উত্তর থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। যেকোন দুর্যোগে আমাদের দেশে খাদ্য সহায়তা দিতে সাধারণত পরিবার প্রতি একই পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী দেয়া হয়। একক পরিবারে ২-৩ জন থাকতে পারে, আবার ৫-৬ জন বা বেশীও থাকতে পারে। পরিবারের প্রকৃত সদস্য সংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সহায়তা কবে থেকে এবং কীভাবে শুরু করা যায়? পরিবারের শিশু, স্তন্যদানকারী মা, গর্ভবতী মা, অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের আলাদা আলাদা খাবারের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করলে খাদ্য সহায়তার প্যাকেজে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ প্রদান আবশ্যিক করা কী আশু প্রয়োজন? খুব সম্ভবত। পত্রিকায় দেখলাম, কোন কোন সরকারী ও এনজিও উদ্যোগে ত্রাণ দেয়া কালে এই দিকটা বিবেচনা করা হচ্ছে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ।

নানা কারণে আমাদের কয়েক লক্ষ বাংলাদেশী ভাইবোন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবৈধ অধিবাসী রয়েছেন। তারা বর্তমান করোনা ভাইরাস সংকটে না পারছেন কাজ করতে, না পারছেন খাবার যোগাড় করতে, অসুস্থ হলে চিকিৎসাসেবা নেয়াটাও তাদের পক্ষে সহজ হচ্ছে না। তারা দেশে ফিরতে চাচ্ছেন। আবার অনেকে ব্যবসার কারণে, বা চিকিৎসা করাতে গিয়ে, বা বেড়াতে গিয়ে ফিরতে পারছেন না। তারাও দেশে ফিরতে চাইছেন। দেশে থাকা উভয় ধরনের পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন ভীষণ উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায়। মানবিক কারণে আমাদের সরকার অত্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। ইতোমধ্যে থাইল্যান্ড ও ভারত হতে অনেককে ফিরিয়ে এনেছেন। আশা করি, ধাপে ধাপে আরো অনেককেই ফিরিয়ে আনবেন।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি আমাদের সতর্ক করেছেন এই বলে যে করোনা-সংকট দীর্ঘায়িত হলে দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। খাদ্য-সুরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করতে তাই তিনি আহবান জানিয়েছেন, প্রতি খন্ড জমি চাষের আওতায় আনতে ও বাড়ীর আশেপাশের কোন জমি খালি না রেখে সবজি চাষ করতে। বর্তমানে মাঠে থাকা পাকা ধান কেটে ঘরে তুলতে আমাদের সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়াসহ বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে খাদ্য সুরক্ষা জোরদার করা যায়। সরকারের এই সময়োপযোগী ও অত্যন্ত বাস্তব আহবানে সাড়া দিয়ে অনেকেই আজ মাঠে। ছাত্র-শিক্ষকগণ ধান কাটছেন, মাননীয় ডি সি মহোদয় রাতের বেলা ধান কাটছেন, ছাত্রলীগের সদস্যরা কৃষকের ধান কেটে দিচ্ছেন, আইন শৃংখলায় নিয়োজিত সদস্যগণ বাস-ভর্তি কৃষিশ্রমিক পাঠাচ্ছেন এক জেলা হতে অন্য জেলায় ধান কাটতে, এসবই অত্যন্ত ভালো দৃষ্টান্ত এবং তাই অনুপ্রেরণামূলক।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একজন মানুষের মনুষত্বের প্রকৃত পরিচয় মিলে অন্যের বিপদে-আপদে, দুর্যোগে-দুর্বিপাকে ও দুঃখ-কষ্টে এগিয়ে আসে কী না, তা দেখে। এটা খুবই আশার ও প্রশংসার বিষয় যে ইতোমধ্যে অনেক ব্যক্তি, সংগঠন, এনজিও ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান মানবিক সহায়তা দেয়া শুরু করেছেন বা শুরু করতে যাচ্ছেন। শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার নজিম উদ্দিন তার ভিক্ষুকতা পেশা হতে সারাজীবনের সমস্ত আয় ১০ হাজার টাকা দান করে দিয়ে আমাদের সবাইকে যেন জানালেন, আমরাও সবাই পারি সাহায্যের হাত বাড়াতে। যারা মানবিক সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছেন, কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের সবাইকে। আরো অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়াবেন, এই বিশ্বাস রাখি।

আমাদের যা যা নেই তা তা পেতে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা চালাই, সদা ব্যস্ত থাকি। যা যা আছে, সেসবের জন্য দিনে কতবার সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেই বা অন্যের উপকারার্থে আমার সম্পদ হতে দান করি? করোনা ভাইরাস আমাদের বলছে: থামো, নিজের দিকে তাকাও, অন্যের দিকেও তাকাও; ভাবো, নিজের কথা ভাবো, অন্যের কথাও ভাবো; নিজে ভালো থাকো, অন্যকেও ভালো রাখতে চেষ্টা করো। আসুন, আমরা সবাই একে অপরকে ভালো রাখতে আন্তরিকতা সহকারে হাত বাড়াই। আমরা বীরের জাতি। প্রায় খালি হাতে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অতীতে যেকোন দুর্যোগ অসীম সাহসে মোকাবেলা করে অতি অল্প সময়েই আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। বর্তমান এই করোনা সংকট কাটিয়ে উঠার বিশ্বাস, মনোবল, সামর্থ ও সম্পদ আমাদের আছে। আমাদের সাহসী, বিচক্ষণ ও আত্মবিশ্বাসী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধাপে ধাপে অনেক প্রণোদনা, সাহায্য-সহায়তা, উপায়, উপদেশ, নির্দেশনা ও কৌশলের ঘোষণা দিয়েছেন। সম্মিলিত সহযোগিতায়, সততা ও স্বচ্ছতায় তাঁর নেতৃত্বে এই করোনা ভয় আমরা অচিরেই করবো জয়।

করোনা ভাইরাসের প্রভাব ব্যক্তি থেকে বিশ্ব

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আতঙ্কিত সবাই। সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও লকডাউন চলছে। এর ফলে ঘরবন্দী সারাদেশের মানুষ। শহরেরই হোক কিংবা গ্রামে সব জায়গায় একই অবস্থা। বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। একই সঙ্গে বেড়েছে মৃতের সংখ্যা। কিছু দেশ সময় মতো যথাযথ ও সময়োপযোগী কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েও ভাইরাসটির বিস্তার প্রতিরোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে। সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে দিয়েছে চিন্তাধারা। উন্মোচন করে দিয়েছে, এত দিনকার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও কাঠামোর বিদ্যমান গলদগুলো। বিশ্বজুড়েই মানুষ এক নতুন উপলব্ধির সামনে দাঁড়িয়ে। এ কারণে মহামারির পরবর্তী বিশ্ব যে অনেক দিক থেকেই এখনকার চেয়ে আলাদা হবে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভালো বা মন্দ যেমন-ই হোক, এই সংকট অভাবনীয় ভাবে বদলে দেবে সামাজিক বিন্যাস। তাই সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয়ে এমন চেতনার উন্মেষ উপলব্ধি হচ্ছে-

'এ যাত্রায় বেঁচে গেলে, ভীষণ করে বাঁচবো। সবাইকে জড়িয়ে ধরে অনেক করে কাঁদবো। এ যাত্রায় রেহাই পেলে, অন্যের কথা ভাববো। যার যেখানে অংশ আছে হিসেবগুলো চুকিয়ে দেবো। একাকী নীড়ের ছানা দু-মুঠো খেলো কিনা খবর নেব। এ যাত্রায় বেঁচে গেলে, অন্যদের আগে বাঁচতে দেব। ঘর থেকে বেড়িয়ে প্রথমে নদীর কাছে ক্ষমা চাইবো। বন পাহাড় আর সাগরের কাছে বিনয়ের সাথে নত হবো। এ যাত্রায় বেঁচে গেলে ঋণ যা আছে পরিশোধ করবো। আর হবো না অহংকারী। আর হবো না রাশভারী। থামিয়ে দেব লোভ লালসার রাহাজানি। ধর্ম নিয়ে নয় আহাজারি, প্রতিনিয়ত সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করবো। এ যাত্রায় বেঁচে বর্তে গেলে, মানুষের তরে মানুষ হব। নতুন করে স্কুলে যাবো। কলেজে যাবো। ফুচকা খাবো। বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেব। হাসিগুলো ছড়িয়ে দেব। ঘুড়ি ওড়াবো রংবেরঙের। নৌকা হবো মুক্ত পালের। এ যাত্রায় বেঁচে গেলে, দুর্বলের কাছে আর যম হবো না। হরিণ মারার ঘাতক তীর হবো না। অসৎ পথের ভীড় হবো না। সত্যি যদি রেহাই পাই। বেঁচে যদি যাই। এ যাত্রায় একটি বার, যত অন্যায় পুষিয়ে দেব। যত হিংসা মিটিয়ে দেব। বাড়ি ফিরলে এবার মায়ের শাড়ির আঁচল হবো। বউ এর চোখের কাজল হবো। ছেলের কাছে ঘোড়া হবো। আর যদি না বাঁচি, যদি হারিয়ে যাই ঐ একাকী অন্ধকারের দেশে, অন্তত দূর আকাশের চাঁদটি হবো। যতটুকু পারি আলো ছড়াবো। (*সংগৃহীত*)

জগত বৈচিত্র্যতায় ভরপুর। কেউ কেউ জগতকে সুন্দর করতে নিজের জীবন বির্সজন দিচ্ছে। কেউ কেউ ধ্বংস করার পরিকল্পনায় মেতেছে। যুগে যুগে কালে কালে কত সভ্যতা, ঐতিহ্য, ইতিহাস বয়ে গেছে। সভ্যতার কালের খেয়ায় ঘটেছে প্রলয়কারী যুদ্ধবিগ্রহ। যেমন- প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ, মহামারী, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি-খরা। এমন সব প্রলয় বিভিন্ন যুগে যুগে আঘাত করেছে। তবুও সারাবিশ্ব একই সাথে একই ভাবে এভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েনি। বর্তমান সময়ে করোনাভাইরাস যেভাবে ব্যক্তি থেকে বিশ্ব আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে। আমরা শুনেছি এবং জেনেছি, 'মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য।' কিন্তু করোনাভাইরাস সেই মানুষকে মানুষের কাছ থেকে আলাদা করেছে। করোনাভাইরাস থেকে সাবধানতার জন্য সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে। বাংলা প্রবাদে আছে, 'সব ভালোর একটা খারাপ দিক থাকে; তেমনি সব খারাপেরও একটা দিক ভালো থাকে।' অর্থাৎ এই করোনাভাইরাস অসংখ্য মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সব বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মোটকথা চারিদিকে স্থবিরতা; নীরব নিস্তব্ধতা। শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, রাস্তা-ঘাটে কোথাও কাউকে বাহির হতে দেওয়া হচ্ছে না। পরিবেশ পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যার দরুণ হুমায়ুন আহামেদের সেই বিখ্যাত নাটকের নাম স্মরণ হচ্ছে- 'কোথাও কেউ নেই'। আসলে পৃথিবীর এমন সব স্থান যা কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়নি। সেই সমস্ত জায়গা করোনাভাইরাসের প্রভাবে একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। দেখে মনে হবে, হ্যামিলিয়নের বাঁশিওয়ালা তার করুণ সুরে সবাইকে নিয়ে যাদু মন্ত্রে বশিভুত করে পালিয়ে গেছে। কি নিদারুণ; কি সুকরুণ বাস্তবতা। একটা বিপন্ন, বিষাদ আর দহনের অভিজ্ঞতা।

অন্যদিকে করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে যে করণীয় বা সর্তকতা সমন্ধে বলা হয়েছে বা হচ্ছে। যা আমাদের সুস্থ জীবন যাপনের জন্য একান্ত অত্যাবশ্যকীয়। প্রথমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। নিজের প্রয়োজনে নিরাপদ থাকা। পরিবেশের যত্ন নেওয়া। কেননা কথায় আছে যদি গাছ বাঁচে তুমি বাঁচবে। অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি মনোযোগী হওয়া। কেননা প্রকৃতি ধ্বংস হলে আমরাও ধ্বংস হয়ে যাবো। নিজের স্বার্থপরতা, লোভ, অহংকার হিংসায় আমরা যেমন অন্ধের মত হয়ে পড়েছিলাম। যেন নিজে বাঁচলে বাপের নাম। স্বীকার করি আর নাই করি নিজেদের অবক্ষয়ের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। তবুও করোনাভাইরাস মানব জীবনযাত্রার অনেককিছুই থামিয়ে দিয়েছে কিন্তু সবকিছু থামাতে পারিনি। সময় এসেছে ব্যক্তি থেকে বিশ্ব পরিবর্তন হওয়ার। কেননা করোনাভাইরাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে মানুষের অবস্থা এবং ক্ষমতার বাহাদুরি কতদূর! এরপরে সেই গল্পের মত বাঘ একদিন ঠিকই আসবে তখন আর কিন্তু রেহাই নেই। মুক্তি পাবো না। সেদিনের অপেক্ষায় না থেকে আসুন সবাই মিলে বাঁচি। সুস্থ ও সুন্দর বিশ্ব গড়ি।

বিল গেটস্ করোনাভাইরাস প্রসঙ্গে তাঁর উপলব্ধি সহভাগিতা করতে গিয়ে বলেছেন, আমরা কোভিড-১৯ থেকে কি শিক্ষা নিতে পারি? তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে যা ঘটে তার পেছনে একটা পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকে। আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, পেশা,

আর্থিক অবস্থা, খ্যাতি ইত্যাদির পরেও প্রকৃতগত ভাবে আমরা একই সমান। যে যত বড় খ্যাতিমান কিংবা ক্ষমতাবান হোন না কেন! যে কোন সময় আপনি কঠিন সংকটে পড়ে যেতে পারেন। করোনাভাইরাস এই বিষয়টি আমাদের খুব ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি বিশ্বাস না করেন। তাহলে টম হ্যাংকস বা প্রিন্স চার্লসকে দেখে বুঝতে পারবেন। আমরা সবাই একে অপরের সাথে দারুণভাবে সম্পৃক্ত। জগতের সবকিছুই একটি অনুবন্ধনে আবদ্ধ। তাই তো দেশের সীমান্তরেখাগুলো পাড় হতে যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। ভিসা, পাপপোর্ট এবং অনুমতির প্রয়োজন তা উপেক্ষা করে করোনাভাইরাস সেই সীমান্তরেখা পাড়ি দিয়ে প্রবেশ করেছে সারা বিশ্বে। যার প্রবাহে বর্তমানে আমরা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে স্বল্প সময়ের জন্য গৃহ বন্দী। অনেকেই এই বন্দীত্বকে গ্রহণ করছে না। নিপীড়ন মনে করছেন। একটু ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন, যারা সারা জীবন ধরে এমন নিপীড়নের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনটা কেমন? নিজের স্বাস্থ্যর কি যে মূল্য এটা এই ভাইরাস বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অথচ এই স্বাস্থ্যটাকে আমরা কত অবহেলা করি। নানা রকমের ক্যামিকেল জাতীয় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে থাকি। আমরা যদি আমাদের শরীরের যত্ন না নেই। তবে অবশ্যই আমরা অসুস্থ্য হয়ে পড়বো। করোনাভাইরাস পুনরায় বুঝিয়ে দিয়েছে জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। যে কোন সময় জীবনের ইতি হয়ে যেতে পারে। তাই এই সংকটময় মুহূর্তে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে জড়বাদী, ভোগবাদী ও বিলাসবহুল সমাজে দামী গাড়ি, বাড়ি আর লাক্সারিয়াস রিসোর্ট নয়। জীবনের বাঁচাতে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হচ্ছে- খাদ্য, পানি আর ওষুধ। একই সাথে আমাদের ক্ষমতার দম্ভ, খ্যাতির দম্ভ, বিত্তের দম্ভ এসব কিছুই বড় কোন শক্তির কাছে নয়। অতি ক্ষুদ্র এক আণুবীক্ষণিক ভাইরাসের কাছে নিমিষেই যে কোন সময় চুপসে যেতে পারে। তাই আমাদের সব রকমের দম্ভকে যেন আমরা সবসময় নিয়ন্ত্রণের মাঝেই রাখি। এই সময়ে আমরা যেন নিজেদের সংশোধন করতে পারি। শিক্ষা নিতে পারি, এটা পৃথিবীর শেষ নয় বরং এক নতুন পৃথিবী গড়ার সূচনা।

করোনাভাইরাস সবার মধ্যে একটা ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়েছে। যদিও থমকে গেছে সারাবিশ্ব তবুও অবশ্যই আবার সুদিন আসবে। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজটি মানুষ ইতিমধ্যে করতে পেরেছে। তা হলো মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এটা ঠিক, আমরা মহাদুর্যোগের সময় পাড় করছি। তবে বিষয়টি এমন নয়, পৃথিবীর সৃষ্টির পরে থেকে এমনটা হয়নি। মানুষকে মাঝেমধ্যে এমন ক্রান্তিকালের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটাও তেমন একটা ক্রান্তিকাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন, 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা' এই সময়ে এর থেকে ভালো আর কী চাওয়ার থাকতে পারে। আমি বলবো, এই আপদ বিদায় হোক। কেননা ইতিমধ্যে সবার মধ্যে একটা হতাশা এসে গেছে। তবে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু সবকিছু নিয়ে আমাদের পরিপূর্ণ একটা জীবন। এটাই জীবনের সবচেয়ে সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং রোমাঞ্চকর দিক। আমরা কেউই জানি না, আগামীকালের প্রভাত কী নিয়ে অপেক্ষা করছে। তারপরেও জীবন এগোনোর অনুপ্রেরণা দেয়। যা কিছু অশুভ, অমঙ্গল; তা কখনোই স্থায়ী হয় না। আমাদের সবার জন্য শুভ ও মঙ্গলময় কিছু অবশ্যই আছে। আমাদের প্রার্থনা হোক, নতুন চেতনা ও সচেতনতা মঙ্গল বয়ে আনুক। পৃথিবীতে শান্তি আসুক। এসবের মধ্য দিয়েও নিজের আত্মিক উন্মেষ ঘটাতে পারি। এই সংকটে সবাই বিষণ্ন মন নিয়ে যেন ঘরে বসে না থাকে। জীবন শেষ হয়ে গেল এমনটা যেন কেউ না ভাবে। তাই যার যেমন অবস্থা তেমন ভাবেই বিভিন্ন আয়োজনের ব্যবস্থা করতে পারি। যেমন- ছবি আঁকা, গান শোনা, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও কবিতার বই পড়া, সিনেমা দেখা, লেখালিখি করা, বিশ্লেষণ ও গবেষণাধর্মী কিছু করা, হস্তশিল্পের কাজ করা, বাদ্যযন্ত্রের চর্চা করা, রান্না করা, জমিয়ে রাখা কাজগুলো শেষ করা, ইনডোর গেম অর্থাৎ ঘরে বসে যে সমস্ত খেলা যায়। কেননা জীবন চলমান। এ ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে জীবন পাড় করা। এটাও আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবে।

করোনাভাইরাস আমাদের অনেক উপলব্ধি দিয়েছে ঠিকই কিন্তু আমরা সব ভুলে যাব। ইতিহাস থেকে অতীতেও মানুষ কিছু শেখেনি। ভবিষ্যতেও শিখবে বলে মনে হয় না। তবে করোনাভাইরাস একটা সুন্দর জীবনের জন্য নিজেকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করছে। অন্যদিকে ভিন্ন মতাদর্শনও আছে, মানুষ তার দুর্দশার দিনটা দ্রুত ভুলে যেতে পারে। আর তা না হলে মানুষ সামনে এগোতে পারত না। যারা মনে করেছে তারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাদেরও সব সিস্টেম ভেঙে করোনাভাইরাস তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। সময়ের সঙ্গে মহামারিগুলোর আকার বদলাচ্ছে। মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই করোনাভাইরাস একটা সাময়িক শিক্ষা। মানুষকে বাঁচতে হবে। অনেক কিছু করতে হবে। আবার নতুন করে জায়গা করে নিতে হবে। আবারও প্রতিযোগিতা হবে। এই মুহূর্তে ভালোবাসা ও মানবিকতা যেমন দেখতে পাচ্ছি। তেমনি সম্পর্ক পাল্টে যাওয়াটাও দেখছি। কঠিন সময়ে দাঁড়ালে প্রতি মুহূর্তে মানুষ নতুন বোধে উপনীত হয়। এখন পুরো পৃথিবীর মানুষের উচিত স্মার্ট আচরণ করা।

অনেকে বলছে এটা **তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।** আসলেই তো তাই। আমরা অনেক আগে থেকেই ধরে নিয়েছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকে ভয়াবহ পরিস্থিতি দাঁড়াবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে। সে রকমই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সারা পৃথিবী যেন এক ঘরে বন্দী। যার নাম লকডাউন। মানুষের সঙ্গে এটা অদৃশ্য শক্তির যুদ্ধ। এই ভাইরাস হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সাদা, কালো, ধনী, দরিদ্র কোনো বাছবিচার নেই। সবাই আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। অন্যদিকে করোনাভাইরাসের কারণে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গেছে। মানুষ মানবিক হতে শিখছে। এই শিক্ষা আমাদের ধারণ করতে হবে। করোনাভাইরাস নিয়ে নানা জন নানা মত দিচ্ছেন। কেউ বায়োলজিক্যাল ওয়্যার বলছে। কেউ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলছে। আসলে এমন পরিস্থিতিতে বলা যায় অনেক কিছুই। হতে পারে এটা একটা মহামারি, যা বিশ্বে এর আগে কেউ কখনও দেখেনি। করোনাভাইরাস ভবিষ্যতের জন্য একটা শিক্ষা। কীভাবে আমরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারি। এ ধরনের কোনো মহামারি হলে কীভাবে খাদ্য মজুত রাখতে পারি। কীভাবে জনগণকে আরও নিরাপদ রাখা যায়। এসব নিয়েও ভাবতে হবে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তা নিয়েই ভাবছে। তাই আসুক যার যার অবস্থানে থেকে আমরা এই দুর্যোগে লড়াই চালিয়ে যাই।

মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি অসীম। এক চিন্তা দিয়ে অন্য চিন্তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব। কল্পনা থেকে চিন্তা। চিন্তা থেকে কর্ম। এভাবেই তো মানুষ এগিয়ে যায়। তাই চেষ্টা করুন নিঃস্বার্থ হবার। কেবল একার কথা ভাববেন না। সবার কথা ভাবুন। মানুষ আশা নিয়ে বাঁচে। এই দুর্যোগ সময়ে আশঙ্কা দিয়ে নয়, আশা ও বিশ্বাস দিয়ে মনটাকে জড়িয়ে রাখুন এবং ভালো থাকুন। আর ভালো থাকার নিয়ম যথাযথ ভাবে পালন করুন। আশা আলোর ঠিকানা দেবে। ভেবে দেখবেন, জীবনে আমরা যতটুকু ভয় পাই। তার বেশির ভাগই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটে না। এটা ভাবলে আপনার মনের ভয় কমবে। যা কিছুর শুরু আছে তার শেষও আছে। কাজেই আজকের এই দুঃসময়টাকেও শেষ হতে হবে। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখুন। এই সংকটের অবসান হবে একদিন। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় থাকি। মঙ্গল হোক সবার।

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

কোটি কোটি গরীব মানুষের আমেরিকা

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বা আমেরিকায় কোটি কোটি গরীব নীরবে কান্নারত। আমেরিকায় সারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে গত দু'শ বছরে বহু জাতির মানুষ এসে বসবাস করছে, লোকসংখ্যা ৩২৮ মিলিয়ন। এখনও পৃথিবীর বহু দেশ থেকে লাখ লাখ মানুষ আমেরিকায় আসছে। বিদেশ থেকে আমেরিকায় আসতে পাগলপারা অনেকে। তারা মনে করেন, আমেরিকা মানে মহাশক্তির দেশ, উন্নত ধনী দেশ, ডলারের দেশ, সারা পৃথিবীর মুরুব্বির দেশ।

যারা আমেরিকা দর্শন করেন তারা বুঝতে পারেন যে, আমেরিকা হল খুব ধনী আর খুব গরীবের দেশ। এখানে একদিকে সম্পদশালী অন্যদিকে অনেকে পথে ঘুমায় কিংবা ভিক্ষা করে; এর মাঝামাঝি থাকা খুবই কষ্টকর। অনেক মানুষ রাস্তায় গাড়িতে ঘুমায়, বর্তমানে বাড়ি ভাড়া দেয়ার সাধ্য অনেক আমেরিকানদের নেই। লস এঞ্জেলেসের অনেক মানুষের নিজ বাড়ি নেই, পরিবার নাই, অনেকে নানা গির্জার ক্যাফেটেরিয়া থেকে উচ্ছিষ্ট খাবার খাচ্ছেন। বিনামূল্যে চিকিৎসা নিতে ভীষণ ভিড়। সান ফ্রান্সেকো, সিয়টেল শহরে অনেক আমেরিকান সপরিবারে বাড়িতে থাকেন। এখানে গৃহহীন মানুষ বাড়ির বদলে গাড়ি ভাড়া নেন। প্রায় ৬০ শতাংশ বিয়ে ভেঙ্গে যায়, নারী ও সন্তানেরা হয়ে যায় রাস্তার মানুষ। আমেরিকার ১০৫ মিলিয়ন মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে রয়েছে। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ছে প্রতি বছর। যুক্তরাষ্ট্র নানা যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিদিন খরচ করছে ৮শ মিলিয়ন ডলার। আমেরিকার মানুষদের মাথায় ঋণের বোঝা ২৩ মিলিয়ন ডলার, যা দেশটির মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বেশি। ঋণের বোঝায় নুয়ে পড়া আমেরিকায় ধার করে হলেও সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ যুদ্ধ মাস্তানি ঠিকই রয়েছে।

আমেরিকা সবই করতে পারে কারণ ডলার পৃথিবীর রিজার্ভ কারেন্সি। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে "বৃটল উড্স এগ্রিমেন্ট" এর মাধ্যমে সনাক্ত হয়েছে যে. ডলার একচেঞ্জ রেট সব সময় ফিক্সড থাকবে এবং অন্যান্য দেশের মুদ্রার দর ডলারের বিপক্ষে উঠানামা করবে। ডলার রেট সর্বদা স্ট্রং পজিশন থাকবে। এই ব্যবস্থার কারণে বিশ্বের সকল দেশকে আমেরিকায় পণ্য রপ্তানি করতে হয়। এই ব্যবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যের তেল ব্যবসায়ীদেরকেও বেশি তেল বেচতে হয় আমেরিকার কাছে। যাতে করে বিভিন্ন দেশের কারেন্সি ঠিক রাখতে হয় ডলারের সাথে।

আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা অক্সফাম বলছে যে, সময়ের বৈষম্য দূরীকরণে সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন কোন দেশই করছে না, শাসকবর্গ এদিকে কোন খেয়াল করে না। অ্যামাজন প্রতিষ্ঠাতা জেয বেজোস এ বছর বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তার সম্পদের পরিমাণ ১২,০০০ কোটি ডলার। অক্সফাম বলছে যে, আগামী দশকের মধ্যে বিশ্বের ২ হাজার ধনকুবেরের উপর যদি ০.৫% শতাংশ হারে কর বাড়াতে যায়, তাহলে বেকারদের জন্য ১৪ কোটি নতুন চাকুরি তৈরি হবে, শুধু শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে। ২ হাজার ধনকুবেরের হাতে থাকা সম্পদ ৬০০ কোটি সাধারণ মানুষের মোট সম্পদের সমান। এই অতিরিক্ত সম্পদ মুনাফার জন্য অনেক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। এই ধনী-গরীবের বৈষম্য কমাতে না পারলে, মুনাফা ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে দুরত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে জেঁকে বসেছে বাজার মৌলবাদ। এর প্রভাব ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে, বিশেষত আমেরিকায় বিশ্বমন্দার পরিপ্রেক্ষিতে, ধনী-গরীবের বৈষম্য আশংকাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। অনেক দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র সৃষ্টি করে চলেছে।

আমেরিকা ও আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে কোটি মানুষ এখনও অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য হাহাকার করছে। এখনও বহু মানুষ না খেয়ে রাতে ঘুমাতে যায়। এখনও অনেক মানুষ রাস্তার পাশে রাত্রি যাপন করছে। বিশ্ব এখন যে অর্থব্যবস্থা অনুসরণ করছে, তাতে করে কয়েকজন লোক প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হচ্ছে। উন্নয়ন বর্তমানে ন্যায্যতাভিত্তিক, বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে একটি সমাজ বা একটি জাতি কত উন্নত তা নির্ভর করে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর নয়, তার সঙ্গে দেখতে হবে সে সমাজ ব্যবস্থা কতটুকু মানবিক, তার উপর। এই কারণে আমেরিকার অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। আমেরিকা উন্নত বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নেই।

আমেরিকায় সীমিত মজুরি, উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ কারারোধের হার, ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট শংকার বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রকৃতি এবং অকার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা, জনগণের মতামতকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিচ্ছে না, আমেরিকার কর্পোরেট সেক্টরের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। এ রকম সামাজিক অবস্থা চলতে থাকলে আমেরিকায় ন্যায্য, প্রাণবন্ত সমাজ বাস্তবায়ন, স্বপ্নই থেকে যাবে।

বিশ্বে সব মানুষই অভিন্ন, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যবধান বাইরে থেকে দেখা যায়, ভেতরের মানুষের কোন ব্যবধান নাই। বেঁচে থাকার লড়াই অভিন্ন, পুঁজিবাদের দাস সব লিডারের চরিত্র একই। সব ভাল মানুষও অভিন্ন। একদিন এই বেশিরভাগ ভাল দরিদ্র মানুষেরা একত্রিত হয়ে ধনী লোকদের সম্পত্তি হরণ করবে। বাস্তবে গণতন্ত্রের নামে, জনগণ নগণ্য সংখ্যক ধনী লোকের ইচ্ছার কাছে জিম্মি ॥

উনিশ'শ তিয়াত্তর/চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের কথা। বর্ষাকালে আমরা তুইতাল থেকে বান্দুরা হলিক্রশ হাই স্কুলে যেতাম ঐ স্কুলেরই শিক্ষক যাকোব স্যারের নৌকায়। স্যারের কোষা নৌকাটা ছিলো বেশ বড় সাইজের। ছোট পরিসরে আয়োজিত নৌকা বাইচে সেই নৌকা অংশগ্রহণ করতো । তো আমরা প্রায় নয়/দশ জন সেই নৌকায় যেতাম। যাকোব

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
গ্রাহক হোন।
নিয়মাবলী দেয়া আছে।

নিয়মিত কলাম

যাকোব স্যারের নৌকা

জীবনের গল্প- ৯

খোকন কোড়ায়া

স্যার ছাড়াও বান্দুরা হলিক্রশ প্রাইমারি স্কুলের আর একজন শিক্ষক আমাদের নৌকায় যেতেন, তার নাম পতিত পাবন বিশ্বাস। দুই স্যার নৌকার মাঝখানে বসে থাকতেন আর আমরা সবাই নৌকা বাইতাম। আমাদের নৌকায় আরো যারা স্কুলে যেতো তারা ছিলো যাকোব স্যারের ছোট ভাই লিনুস পেরেরা, লিও মাতব্বর বাড়ির তিন ভাই, ইউজিন, পরিমল ও নির্মল, মুসলিম পাড়ার সৈজদ্দীন এবং হিন্দু পাড়ার জুতলাল বৈরাগী (বাদল)।

পরিমল নৌকার পিছনে বসে হাল ধরতো আর জুতলাল বসতো আগায় (নৌকার সামনে)। নিষেধ করা সত্ত্বেও নির্মল প্রতিদিনই যাকোব স্যারের পিছনে বসতো। আমি বসতাম ডানপাশে, পতিত স্যারের পাশে। ইউজিন আর সৈজদ্দীন বসতো স্যারদের সামনে। পরিমল ছিলো একটু আবেগপ্রবণ। মাঝে মাঝে আবেগের বশে উল্টাপাল্টা কথা বলে বসতো, মাঝে মাঝে আবার অন্যমনষ্ক হয়ে হাল ঠিক রাখতে পারতো না, নৌকা ঘুরে যেতো অন্যদিকে যার কারণে স্যারদের বিশেষ করে যাকোব স্যারের বকা ওর কপালেই বেশী জুটতো। সৈজদ্দীন বকা খেতো বেশী কথা বলার জন্য আর ইউজিন বকা খেতো বোকা বোকা প্রশ্ন করার জন্য। যেমন একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে আমাদের নৌকাটা বিল পেড়িয়ে খাল দিয়ে চলছে। হঠাৎ পতিত স্যার বললেন, পরিমল নৌকা ভিড়াও। কোন প্রশ্ন না করেই পরিমল নৌকা ভিড়ালো। খালের পারে পাট ক্ষেত ছিলো। পাট গাছগুলি ছিলো লম্বায় মানুষের চেয়ে উঁচু। পতিত স্যার নৌকা থেকে নেমে সেই পাটক্ষেতের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা বুঝতে পারলাম স্যার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু ইউজিন যাকোব স্যারকে বললো- স্যার, পতিত স্যার নৌকা থেকে নামলো কেন, পাটক্ষেতের ভিতর ঢুকলো কেন? যাকোব স্যার রেগে বলতেন - মঘা (বোকা), তুমি কিছু বোঝ না?

নির্মল নৌকা বাওয়ায় ভীষণ ফাঁকি দিতো। কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে নৌকা বেয়ে কিছুক্ষণ আবার হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতো। যাকোব স্যার পিছন ফিরে বলতেন- নির্মল জোরে জোরে চাপ দাও (নৌকা বাও)। নির্মল তখন নৌকা বাওয়ার ছলে পানি ছিঁটাতে থাকতো। যাকোব স্যারের জামা ভিজে যেতো, আর স্যার রেগে গিয়ে নির্মলকে বলতেন- নির্মল, পানি ছিটাও কেন? নির্মল বলতো- স্যার, জোরে বৈঠা বাইলে পানি ছিটবেই। অসহায় স্যার তখন বলতেন - ঠিক আছে, তাহলে আস্তেই বাও। আমার ভাগ্যে সবচেয়ে বেশী বকা জুটতো আমি রোগা ছিলাম বলে। যত জোরেই নৌকা বাই, স্যাররা বলতেন - গায়ে জোর নাই? আরো জোরে চাপ দাও। আগার গলুইয়ে জোর আসন করে বসা জুতলালের কোলের উপর একটি বই খোলা থাকতো সব সময়। সারা রাস্তায় সে যেমন নন স্টপ বই পড়তো, তেমনি নন স্টপ নৌকাও বাইতো। তাই তার কপালে বকাও জুটতো কম।

একদিন বিকেলে ছুটির পর আমরা নৌকা নিয়ে তুইতাল ফিরছিলাম। নয়নশ্রী গ্রাম পার হয়ে বিলে আসতেই ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হল। শৈল্যার বট গাছ পার হতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামলো, সঙ্গে দমকা বাতাস। বিল পার হয়ে আমরা যখন খালে ঢুকলাম তখন আকাশ প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করেছে। প্রচ-ঝড় আর তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর কটাস কটাস শব্দে বাজ পড়ছে। নৌকায় ছাতা শুধু একটা। দুই স্যার সেটার সাহায্যে ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার বৃথা চেষ্টা করছেন আর আমরা কাকভেজা হয়ে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। বর্ষায় খালের দুই পার ডুবে একাকার হয়ে গেছে। কোনটা খাল আর কোনটা পার বোঝা মুশকিল। যাকোব স্যার বললেন - পরিমল নৌকা সাবধানে চালাও, পারে উঠাইওনা, নৌকা কিন্তু ঠেকে যাবে। এ যেন পাগলকে নৌকা ডুবানোর কথা মনে করিয়ে দেয়া। কিছুক্ষণ পরই পরিমল পারে নৌকা তুলে দিলো, আর নৌকা ঠেকে গেলো। সবাই বৈঠা দিয়ে অনেক চেষ্টা করার পরও নৌকা নামাতে পারলাম না। স্যার বললেন - নৌকা ঠেলে নামাতে হবে, তোমরা কেউ কেউ নামো। পরিমল একাই নামলো কিন্তু নৌকা ঠেলার বদলে সে কিছুক্ষণ ভয়ঙ্কর আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো - "বাংলার কি রূপ !" যাকোব স্যার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন - মঘা (বোকা), আমরা শীতে কাঁপছি আর তুমি বল- বাংলার কি রূপ!

স্কুলে যাওয়ার সময়ও সঙ্গে দুজন শিক্ষক, ফেরার পথেও তাই। স্কুল ছুটির পর ছাত্রদের মধ্যে যে মুক্তির সীমাহীন আনন্দ কাজ করে, আমাদের মনে সেই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হতো না কারণ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের নৌকায় উঠতে হতো। আর একবার নৌকায় উঠলে কোনরকম দুষ্টামি, ফাজলামি কিংবা খোশগল্প করার সুযোগ থাকতো না। সপ্তাহের দুটি দিন আমাদের একটু অন্যরকস কাটতো, শুক্রবার ও বুধবার। শুক্রবার ছিলো হাফ স্কুল, বারটায় ছুটি হয়ে যেতো। ছুটির পর আমরা সবাই বান্দুরা বাজারে যেতাম। কেনাকাটা করার জন্য আধা ঘন্টা সময় বরাদ্দ ছিলো। বাজার করতেন মূলতঃ স্যাররাই, তবে আমরাও মাঝে মাঝে ইলিশ মাছ, লরেন্স বেকারীর রুটি-বিস্কুট এইসব কিনতাম। ঐ আধা ঘন্টা সময় আমরা মুক্ত স্বাধীন। মনের আনন্দে বাজারে ঘুরে বেড়াতাম, এটা সেটা কিনে খেতাম আর যত ধরনের দুষ্টামি ফাজলামি আছে সব করতাম। বাজার করা শেষ হলে লরেন্স বেকারী থেকে আধা সের চাড়া বিস্কুট কেনা হত। এই বিস্কুটের দাম একেক শুক্রবার একেক জন দিতো। এরপর নৌকায় উঠে সবাই মিলে সেই চাড়া বিস্কুট খেতে খেতে বাড়ি ফিরতাম। বুধবার বান্দুরা পশ্চিম পাড়ে হাট মিলতো। স্কুল ছুটির পর বিকেলে আমরা হাটে যেতাম। নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের সঙ্গে হাট থেকে কেনা হত একটি কাঠাল। সেই কাঠালের দামও একেক বুধবার একেক জন দিতো। ফেরার পথে নৌকায় গোল হয়ে বসে সবাই মিলে কাঠাল খেতাম। অনেক সুস্বাদু, মুখরোচক খাবার খাই এখন কিন্তু সেই শুকনো চাড়া বিস্কুট আর কাঠাল খেয়ে যে তৃপ্তি পেতাম কোন কিছুতেই তা পাইনা।

যাকোব পেরেরা স্যার ছিলেন কালীগঞ্জের মানুষ। বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে আঠারোগ্রামে আসেন। এরপর পুরান তুইতাল গ্রামের সেলিন গমেজের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শ্বশুর বাড়িতেই থেকে যান আজীবন। যাকোব স্যার এখন পরপারে। গভীর শ্রদ্ধায় তার আত্মার

চিরশান্তি কামনা করছি। পতিত পাবন স্যার অনেক বছর আগেই স্বপরিবারে ভারত চলে গেছেন। বেঁচে আছেন কিনা, জানি না। স্যার যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন। আপনাকে শ্রদ্ধা জানাই। পরিমলরা তিন ভাই সেই স্কুল জীবনেই স্বপরিবারে তাদের বাবার কর্মস্থল ভারতের পাটনায় চলে গেছে। জুতলালও স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভারত চলে গেছে, তা-ও প্রায় বিশ বছরতো হবেই। সৈজদ্দীন গ্রামেই থাকে, শুনেছি দলিল লেখার কাজ করে। লিনুসদা (যাকোব স্যারের ভাই) রিটায়ার্ড করে এখন তাদের গ্রামের বাড়ি কালিগঞ্জেই আছে। সবার জন্য আমার ভালোবাসা ও শুভ কামনা।

বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলকে উপলক্ষ করে এত কিছু লেখার পর একজন শিক্ষককে নিয়ে যদি কিছু না লিখি তবে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার এই শিক্ষকের নাম আন্তনী রোজারিও। কেরানী স্যার নামেই তিনি অধিক পরিচিত কারণ বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলে কেরানীর চাকরি দিয়েই তার কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীতে তিনি শিক্ষক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। আন্তনী স্যারের পড়ানোর স্টাইলটি ছিলো চমৎকার। অংকে গোল্লা পাওয়া ছাত্রকেও তিনি অংক বুঝিয়ে দিতেন এক নিমেষে। ইংরেজীতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তার ইংরেজী হাতের লেখা ছিলো খুবই সুন্দর। ডান দিকে কাত করা টানা হাতের লেখা এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো যে স্কুলের সব ছাত্রই ওভাবে লেখার চেষ্টা করতো এবং একসময় লেখার ঐ স্টাইলটা বান্দুরা স্কুলের লেখা নামেই পরিচিতি লাভ করে। তবে স্যার কিন্তু ভালো ছাত্র ছিলেন না। অংকে মাত্র ৩৬ (সর্বনিম্ন পাশ নম্বর) নম্বর পেয়ে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন। ইংরেজিতেও তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তার হাতের লেখা ছিলো খুব বিশ্রী। শুধুমাত্র প্রবল অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি নিজেকে বদলে ফেলেছিলেন। স্যারের রসবোধ ছিলো প্রচ-। এত মজা করে তিনি পড়াতেন যে তার ক্লাসে কেউ অনুপস্থিত থাকতো না। ছাত্রদের তিনি যেমন আদর করতেন, তেমন শাসনও করতেন, গালিও দিতেন। তবে তার গালিও ছাত্রদের কাছে আদরের মতই মনে হত। আন্তনী স্যার আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে তবে তার স্মৃতি সবার হৃদয়ে এখনো অম্লান। একবার তার সংস্পর্শে যে এসেছে সে কখনো তাকে ভুলতে পারবে না। স্যারের বিদেহী আত্মার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি॥

শুন্য খাঁচা

শাহান তারা হক আলো (প্রয়াত)

হসপিটালের নরম বিছানায় শুয়ে
আমার মা-জাননী।
ভাবছে আর ভাবছে
বিগত দিনের কত স্মতি
ভাসছে একের পর এক দৃশ্যপট
আধো বোজা নিম্মিলিত আঁখি।
সবাই ভাবে বিভোর ঘুমে
অচেতন দেহ।
বয়সের ভাবে অস্থি-মজ্জা মিশে গেছে
হৃদয়ের অতল গহ্বরে।
একে তো আর উঠানো যাবে না
বর্তমানের দ্বারে।
একের পর এক অস্ত্রের আঘাতে
ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে দেহখানি
মুক্তি চায়, বন্দী খাচা হতে।
লৌহ তারে জং ধরেছে
কে জানে কখন ভেঙ্গে পড়বে
এ-খাঁচাটি।
অবশেষে ভেঙ্গে গেল জীন পিঞ্জর
শূণ্য হলো খাঁচার সাথে
পরিজনের ব্যথিত হৃদয়।

মৃত্যু বার্ষিকীর স্মরণে

‘তোমরা ছিলে তোমরা আছ থাকবে আমাদের হৃদয় মাঝারে।’

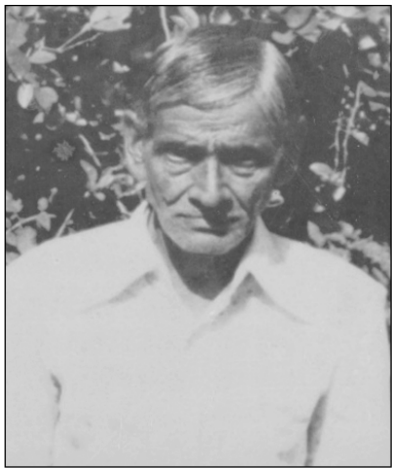

প্রয়াত ফ্রান্সিস পিনারু
জন্ম : ১৫ ডিসেম্বর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জুলাই, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
সোনাপুর, নোয়াখালী

প্রয়াত লিনা পিনারু
জন্ম : ৯ ডিসেম্বর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ মে, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
সোনাপুর, নোয়াখালী

প্রিয় বাবা ও মা,

তোমরা আমাদের সংসারের মায়া ছেড়ে পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছো। তোমাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি। বিশ্বাস করি, প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তোমাদের তাঁর কাছে স্থান দিয়েছেন। তোমাদের গুণাবলী যা আমাদের জীবনের মাধ্যমে যেন প্রকাশ করতে পারি। তোমরা স্বর্গ হতে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন বাকী জীবনে ঈশ্বরের কৃপায় ভালমত জীবন পথে চলতে পারি। প্রভু আমাদের বাবা ও মাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-
তোমাদেরই সন্তানেরা, সোনাপুর, নোয়াখালী।

বিপ্র/২০৪/১৮

মায়ের ভালোবাসা

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

অর্পা একজন উদ্যমী মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই সে পরিবারে প্রার্থনা পরিচালনা, গির্জায় গিয়ে পাঠ ও গান পরিচালনা করতো। তার সাথে সে আশেপাশের ছোট ভাইবোনদেরও নিয়ে যেত। সবার খুব প্রিয় অর্পা। পড়াশুনায় মোটামুটি হলেও দেখতে বেশ সুন্দরী। মায়ের কাছ থেকে শিখেছে কিভাবে বড়দের সম্মান করতে হয় ও ছোটদের ভালবাসা দিতে হয়। ইন্টারমিডিয়েট শেষ করতে না করতেই অর্পার বিয়ে হয় এক ধনী পরিবারে। সে তার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে গ্রামে বাস করত। গ্রামে থাকতে অর্পার ভালোই লাগে। একসময় অর্পার গর্ভে সন্তান আসে, তখন সবাই মিলে তার যত্ন নিতে শুরু করে। নির্দিষ্ট সময়ে অর্পা একটি ফুটফুটে মেয়ের জন্ম দেয়। মেয়ের নাম রাখা হয় আদ্রিতা। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অর্পা তার ভূবন খুঁজে পায়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যাতে করে সে তার মেয়েকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে। আর তাই প্রতিদিন মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করে। অর্পার এই ঈশ্বর নির্ভরশীলতায় সকলেই মুগ্ধ হয় আর মেয়েটিও সকলের আদরে ও ভালবাসায় বড় হয়ে উঠতে থাকে। আদ্রিতা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, কেজিতে পড়া শুরু করে। অর্পাও শিশুমঙ্গল সংঘের এনিমেটর হয়ে মেয়ে আদ্রিতাকে নিয়ে গির্জা ও প্রার্থনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। মা ও মেয়ে দু'জনেই খুশিতে জীবন কাটাতে থাকে। আদ্রিতার বয়স যখন ৬ তখন অর্পা আবার গর্ভবতী হয়। আগের মতই পরিবারের সকলে অর্পার বিশেষ যত্ন নিতে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে শিশুটি যখন এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন দেখা যায় একটি মেয়ে সন্তান। আবারো মেয়ে সন্তান হওয়ায় পরিবারের সবাই অর্পাকে অপমান করে এবং এক পর্যায়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দেয়। ছোট আদ্রিতা কিছু না বুঝেই কান্না জুড়ে দেয় আর সবাইকে বলে তোমরা আমার মাকে বকছো কেন। বাবাকে বলে, বাবা, দেখো, ছোট বনু, ঠিক তোমার মতো আর আমি মার মতো। কিন্তু অর্পার স্বামী অর্থাৎ আদ্রিতার বাবা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অর্পার স্বামী পর্যন্ত অর্পাকে বুঝলো না। সন্তানটিকে ত্যাগ করতে অর্পাকে জোর করে। কিন্তু অর্পা কিছুতেই তার সন্তানটিকে ত্যাগ করতে রাজী হয়নি, বরং সন্তানের ভালোবাসার কারণে সে স্বামীর সংসার ছেড়ে দিয়ে বাবার বাড়ি চলে যায়। দু'কন্যাকে সাথে নিতে ভূল করেনি। অর্পা অনেক পরিশ্রম করে তার মেয়েদেরকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আদ্রিতা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে আর চিন্তা করে মাকে কোন ভাবেই দুঃখ দিবেনা। সবসময় ভালবাসায় আগলে রাখবে আর বোনটিকেও কোন দুঃখ দিবে না। বাবার ওপর একটু রাগ হয়। বাবাতো ওকে অনেক আদর করতো, ভালবাসতো। ছোট বোনকে করে না কেন! তো মাঝে মাঝে বাবার কথাও মনে করে আর বলে, ইস্, বাবা যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে কতই না মজা হতো। মাকে দুয়েকবার বারবার কথা বললেও মা নীরব থেকেছেন। কোন অভিযোগ করেননি। মেয়েদের বলেছেন প্রার্থনা করতে। অর্পা বড় মেয়েকে ডাক্তার হতে সাহায্য করে এবং ছোট মেয়েকে ওকালতি পড়াচ্ছে। অর্পা তার সন্তানদেরকে শিখিয়েছে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে সাদরে গ্রহণ করতে, সকলকে ভালোবাসতে এবং সকলের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে। পরিবারের কেউ মেয়ে সন্তানটিকে গ্রহণ না করলেও মা তার সন্তানকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করেনি বরং প্রমাণ করেছে যে, মেয়ে সন্তানও ঈশ্বরের দান। 'একমাত্র মা-ই, সেই ব্যক্তি যে তার সন্তান যেমন-ই হোক না কেন ভালবাসা দিতে একটুও দ্বিধা করে না বরং ভালোবাসা দিয়ে রাঙিয়ে তোলে।"

প্রিয় পাঠক বন্ধু, আসুন আমরা ঈশ্বরের দানকে গ্রহন করতে শিখি। ছেলে-মেয়ে উভয়ই তো তাঁরই দান। ছেলেমেয়েরা যেন মায়ের স্বপ্ন পূরণে সর্বদা সহায়তা করে।

আমার মায়ের মিষ্টি হাসি

মালা চিরান

মনে পরে আমার মায়ের মিষ্টি হাসি
সমুদ্র ঢেউয়ের মত ছিল আমার মায়ের ভালবাসা
মধুময় ছিল, আমার মায়ের মিষ্টি হাসি।
আমার মা যদিও নেই এই সুন্দর পৃথিবীতে
তব মনে পড়ে বেশী করে আমার মায়ের মিষ্টি হাসি।
আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন মায়ের আদরে বড় হয়েছি
পড়াশুনা করেছি আমি আমার মায়ের কাছে।
মধুময় সুরে ছড়া, কবিতা, গল্প, অনেক সুন্দর রূপ কথার
গল্প পড়ে শুনাতো আমার মা।
আনন্দে ভরে দিতো আমার মন,
চারটি বছর পার হয়ে গেল
মাকে হারিয়েছি এই সুন্দর পৃথিবীতে
মা যে আমার নেই, তব মনে পড়ে
আমার মায়ের ভালবাসা আর মিষ্টি হাসি।
কী অমৃত ছিল আমার মায়ের মুখের বাণী
আমার দুটি চোখে ভেসে উঠে
আমার মায়ের মুখচ্ছবি,
মা, লাল পাড় আকাশী শাড়ী পড়তো
আমার খুবভালো লাগতো, ব্যথিত হৃদয়ে শূন্য ঘরে
প্রদীপ মালা জ্বালিয়ে
মাকে মনে মনে ভাবি গভীর দীর্ঘশ্বাসে।
মনে জেগে উঠে মায়ের কাঁকন দুটি ছিল, দুটি হাতে
তাইতো আজো মনে পড়ে
আমার মায়ের মিষ্টি হাসি।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

মুসলিম ও খ্রিস্টানদের উপাসনালয় রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে ভাতিকান

মুসলমানগণ যখন রমজান মাস পালন করছে, তখন ভাতিকান মুসলিম ও খ্রিস্টানদের জোর আহ্বান জানাচ্ছে পবিত্র উপাসনায়গুলোকে রক্ষা করার জন্য। ১ মে

পোপীয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কাউন্সিল একটি বাণী দেয়, যেখানে রমজান মাসের মূল বিষয়ের উপর জোর দিয়ে বলা হয়, এটি আধ্যাত্মিক নিরাময় ও উন্নতি, গরীবদের সাথে সহভাগিতা এবং আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে বন্ধন আরো দৃঢ় করার সুযোগ আনে। উক্ত কাউন্সিল রমজান মাস উপলক্ষে প্রত্যেকজন মুসলিম ভাইবোনদের প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কাউন্সিলের বাণীতে বলা হয়, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের জন্য যথাক্রমে গির্জা ও মসজিদ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রার্থনার জন্য সংরক্ষিত স্থান। এগুলো এমনভাবে তৈরি ও সাজানো হয় যা নীরবতা, ধ্যান ও অনুধ্যানের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ভক্তি উপাসনার এই স্থানগুলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কাউন্সিল জীবনের বিশেষ ঘটনাসমূহ যেমন বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং পার্বণের জন্য আধ্যাত্মিক আতিথেয়তার স্থান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই উপাসনালয়গুলো বিশ্বাসীদের একত্রিত করার একটি চিহ্ন। এ স্থানগুলো কাউকেই আলাদা করে না। সম্প্রতি গির্জা, মসজিদ ও সিনাগগে (সমাজগৃহে) যারা নির্বোধভাবে হামলা চালিয়েছে পোপীয় সংলাপ কাউন্সিল তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। উপাসনার এইস্থানগুলোকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক যে উদ্যোগ সেগুলোর প্রশংসাও করেছেন উক্ত কাউন্সিল। আশা করেছেন যে, সকলের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহযোগিতা-ই পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়বে এবং ভক্তি-উপাসনার স্থানসমূহকে সুরক্ষিত করতে সক্ষম করে তুলবে।

পোপ ফ্রান্সিস নতুন দু'জন 'কার্ডিনাল বিশপের' নাম ঘোষণা করেন

কাথলিক মণ্ডলীতে কার্ডিনাল একটি বিশেষ সম্মানীয় উপাধি ও দায়িত্ব। কর্মদায়িত্বের কারণে তিন ধরণের কার্ডিনাল রয়েছে মণ্ডলীতে; তা যথাক্রমে কার্ডিনাল বিশপ, কার্ডিনাল যাজক ও কার্ডিনাল ডিকন। ১ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ভাতিকান নিউজ প্রকাশ করে যে, পোপ ফ্রান্সিস কার্ডিনাল লুইস আন্তনিও তাগলেকে কার্ডিনাল বিশপ উপাধিতে উন্নীত করেছেন। এই মনোনয়ন দেওয়া হয় গত ১৪ এপ্রিল যখন আর্চবিশপ

এডগার পেনা পার্‌রা পোপ মহোদয়ের সাক্ষাতে যান। পোপ মহোদয় কার্ডিনাল তাগলেকে অন্যান্য কার্ডিনাল বিশপদের মতই সকল মর্যাদা দিয়েছেন। কার্ডিনাল তাগলে ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রিফেক্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। যাজকসংঘের প্রিফেক্ট কার্ডিনাল বেনিয়ামিনো স্তেল্লাকেও 'কার্ডিনাল বিশপের' মর্যাদা দান করা হয়েছে। তিনি পর্তো-সান্তা রুফিনারও দায়িত্ব পান। ১ মে তারিখেই ভাতিকান পবিত্র রোমান মণ্ডলীর সহকারী কামেরলেনিয়োর মনোনয়ন দেন আর্চবিশপ ইলসোন দি জেজুস মনতানারিকে। তিনি বর্তমানে বিশপ সংঘের সেক্রেটারী। সহকারী কামেরলেনিয়ো হিসেবে তিনি কার্ডিনাল কেভিন ফেররেল এর সাথে কাজ করবেন। উল্লেখ্য কামেরলেনিয়ো পোপীয় বৈষয়িক সম্পদ ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও আর্থিক দিকটা দেখে থাকেন।

ফিলিপাইনের বিশপগণ মা মারীয়ার কাছে তাদের দেশকে উৎসর্গ করবেন

করোনাভাইরাসের কারণে ফিলিপাইনে মৃত্যু ঘটতে থাকায় দেশটির বিশপগণ আগামী ১৩ মে ফাতেমা রাণীর পর্বদিনে নির্মল হৃদয়

মারীয়ার কাছে দেশকে উৎসর্গ করবেন বলে জানিয়েছেন। গত ২৭ এপ্রিল ফিলিপাইন বিশপস্ কনফারেন্স প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশকে চিঠির মাধ্যমে তা জানিয়েছে। এটিকে আর্চবিশপ রমোলো ভাল্লেস দারুণ একটি উদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই উৎসর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিশ্বাসের বর্ষে ফিলিপাইন মা মারীয়ার নিষ্পাপ হৃদয়ের কাছে উৎসর্গকৃত হয়েছিল। ম্যানিলা আর্চডায়োসিসে এই উৎসর্গকরণ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে। প্রথমে উৎসর্গের তাৎপর্য তুলে ধরা হবে। ১০ মে থেকে শুরু হবে ত্রিদিবসীয় বিশেষ প্রস্তুতি। অনুতাপসূচক প্রার্থনা ও রোজারিমালা প্রার্থনা থাকবে। ১৩ মে হবে উৎসর্গের মূল অনুষ্ঠান। বিশপ ব্রোডেরিক পাবিল্লো অমলোদ্ভব মা মারীয়ার বাসিলিকাতে এ উৎসর্গের অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। ৫টি শহরের মেয়রগণ এ উৎসর্গকরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিবেন। বিশপ পাবিল্লো বলেন, এটি কত না সুন্দর যখন ঈশ্বরের জনগণ তাদের সিভিল ও ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে নিজেদেরকে কুমারী মারীয়ার কাছে উৎসর্গ করে। আমরা তা করছি যাতে করে ধন্যা মা মারীয়ার শক্তিশালী মধ্যস্থতায় করোনাভাইরাসের এই সময় অতিক্রম করতে পারি ও কোয়ারেন্টাইনের পর নতুন জীবন ধারা শুরু করতে পারি।

তথ্যসূত্র: news.va

সপ্তাহের আলোচিত সংবাদ

প্রকৃতি থেকেই উৎপত্তি করোনা ভাইরাসের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অনেক দিন থেকে দাবি করে আসছেন যে চীনের ল্যাবে করোনা ভাইরাস তৈরি হয়েছে। আর এর প্রমাণ তার কাছে আছে। কিন্তু গত শুক্রবার (১/৫) সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মাইকেল রায়ান বলেন, অসংখ্য বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বার বার শোনার পর এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে এটা প্রকৃতি থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে করোনার উৎপত্তি হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কোন প্রাণী থেকেই করোনা মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ করোনার উৎপত্তি নিয়ে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে। যদিও চীনের পক্ষ থেকে এই তদন্তের দাবি প্রত্যাখান করা হচ্ছে।

করোনার ওষুধঃ 'রেমডেসিভির' ব্যবহারের অনুমোদন যুক্তরাষ্ট্রের

করোনা চিকিৎসার জরুরি প্রয়োজনে গত শুক্রবার 'রেমডেসিভির' ওষুধ ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। গত শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ কথা জানান। করোনাভাইরাসের পরীক্ষামূলক ওষুধ রেমডেসিভির নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আশাব্যঞ্জক কথা শোনা গিয়েছিল। গত বুধবার করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরীক্ষামূলক ওষুধ রেমডেসিভির নিয়ে আশার কথা বলেছিলেন মার্কিন গবেষকেরা। ওষুধটি নিয়ে একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ৩০ শতাংশ রোগীর দ্রুত সেরে ওঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

করোনার সময়ে জরুরি সাহায্য পেতে ফোন করুন

সর্দি-কাশি ও জ্বরে চিকিৎসকের পরামর্শ

জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) নম্বর: ১০৬৫৫ ও ০১৯৪৪৩৩৩২২২

ই-মেইল: iedcrcovid19@gmail.com

করোনাবিষয়ক তথ্য পেতে এবং সম্ভাব্য আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য দিতে

ওয়েবসাইট: corona.gov.bd স্বাস্থ্য বাতায়নের হটলাইন নম্বর ১৬২৬৩

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন নম্বর ৩৩৩

সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর: ০১৭৬৯০৪৫৭৩৯

মিথ্যা বা গুজব প্রচারের বিষয়টি নজরে এলে ৯৯৯ অথবা ৯৫১২২৬৪, ৯৫১৪৯৮৮

দাফন কার্যক্রমে সহায়তা পেতে

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই যুগ্ম সচিবের মুঠোফোন নম্বর : ০১৭১২০৮০৯৮৩ ও ০১৫৫২২০৪২০৮

করোনা পরিস্থিতিতে সহায়তার জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন

প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ফোন বা এসএমএস করা যাবে, প্রতি দিন এবং যেকোনো সময়।

টোল ফ্রি নম্বর: ১০৯

নিজেদের রেশন থেকে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে সেনাবাহিনী

করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতায় হিমশিম খাচ্ছে বিশ্ব। আতঙ্কে উদ্বিগ্নে স্থবির ও অচল সবকিছু। মানুষের জীবনের মূল্যকেই সবাই বড় করে দেখছেন। কিন্তু এই মহাদুর্যোগেও মানবতার টানে অতীতের সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতোই নির্ভীকচিত্তে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সামাজিক দূরত্ব বা হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতের বৃত্তের ভেতরই নিজেদের বন্দি না করে মানবিক হৃদয় নিয়েই দেশের প্রতিটি জেলায় জেলায় করোনার ছোবলে নিঃস্ব, অভাবী ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে সেনারা নিজেদের সমর্পণ করছেন। সরকারের নির্দেশে প্রায় এক মাস যাবৎ দেশের ৬২ টি জেলায় সক্রিয় রয়েছেন সেনা সদস্যরা। মাঠে থাকা সেনা সদস্যদের ধৈর্য, সহনশীলতা ও সৎ সাহসের পরিচয় দিয়ে জনগণের পাশে থেকে তাদের আস্থা অর্জনের কঠোর বার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। তিনি বলেন, 'করোনা ভয়ে আমরা এক ইঞ্চিও পিছু হটবো না। জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা আমাদের পেশাদারীত্ব, সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবো।'

করোনা মোকাবেলায় জোটবদ্ধ হয়েছে ৬টি মানবিক সহায়তা সংস্থা

নভেল করোনাভাইরাসের (কভিড-১৯) চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একযোগে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশে কর্মরত প্রথম সারির ছয়টি আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থা-প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সেভ দ্য চিলড্রেন, কেয়ার বাংলাদেশ, অক্সফাম, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং কারিতাস বাংলাদেশ।

কনসোর্টিয়ামটি ঝুঁকিতে থাকা সম্প্রদায়গুলোর জন্য স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি এবং পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যকর কর্মসূচির ব্যবস্থা ও উন্নত সেবাদানের মাধ্যমে কভিড -১৯ এর ব্যাপকতা কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে। বর্ষার মৌসুম আসন্ন হওয়ায় মানবিক সহায়তা বিশেষজ্ঞরা দুই ধরণের জরুরি অবস্থা নিয়েই উদ্বিগ্ন। তাদের আশঙ্কা

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের সাথে বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় যুক্ত হলে একটি বড় সঙ্কট সৃষ্টি করবে এবং এই ভাইরাসের বিস্তারকে ত্বরান্বিত করবে। অস্ট্রেলিয়ান হিউম্যানিটারিয়ান পার্টনারশিপ, অস্ট্রেলিয়া সরকার এবং মানবিক সংস্থাগুলোর একটি অংশীদারি জোট, যার মাধ্যমে সংস্থাগুলো সংঘাত, বিপর্যয় এবং অন্যান্য মানবিক সংকট মোকাবেলায় জীবন বাঁচাতে, দুর্দশা লাঘবে এবং আক্রান্তদের মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে কাজ করে।

সৌজন্যে: কালেরকণ্ঠ, ইত্তেফাক, প্রথম আলো

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ১৬
প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী অনলাইন ই-পেইজ

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বনে করণীয়
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নির্দেশনা

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

আপনাদের সকলকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি ও প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা!

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া নোভেল করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) বাংলাদেশেও সংক্রমিত হয়েছে এবং হচ্ছে। জনবহুল দেশ হিসাবে এই রোগ ব্যাপক আকারে সংক্রমনের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে ঝুঁকি এড়াতে লক্‌ডাউন করার কথা সুপারিশ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। আপনারা নিয়মিত সংবাদ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে এই রোগের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের বিশপগণ পরিস্থিতি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই নানাধরনের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সারাবিশ্বের সকলকে এই রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্তে প্রতিদিন বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত ও পরিবারে প্রার্থনা করার বিনীত আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সবাইকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা পালন করতে ও এই রোগের প্রতিকারে নিয়মিত প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

১. বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, জনসমাগম এড়িয়ে চলুন এবং যার যার অবস্থান থেকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সহায়তা করুন।

২. নোভেল করোনাভাইরাস সম্পর্কে আতঙ্কিত না হয়ে ব্যক্তিগত ভাবে ও পরিবারে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৩. সাবান পানি দিয়ে কম পক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবৎ হাত ভালমত ধৌত করুন, বার বার হাত পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।

৪. হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন। যেখানে সেখানে কফ ও থুথু ফেলবেন না।

৫. হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড়/রুমাল দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন। হাত, কাপড়/রুমাল সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৬. আক্রান্ত ব্যক্তি হতে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন ও নিরাপত্তার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন।

৭. গণপরিবহন যদি একান্তই ব্যবহার করতে হয়, মাস্ক ব্যবহার করা; কোনকিছু স্পর্শ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা; যাত্রা শেষে স্যানিটাইজার দিয়ে কমপক্ষে শরীরের খোলা জায়গা জীবানুমুক্ত করা;

৮. করোনা ভাইরাস থেকে নিরাময়ের জন্য নানা প্রকার গুজব, কুসংস্কার, অপপ্রচার পরিহার করুন;

পালকীয় যত্নে করণীয়

৯. অসুস্থ ও বৃদ্ধ খ্রিস্টভক্তগণকে বর্তমান জরুরী অবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানে নিরুৎসাহিত করা;

১০. মুখে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন, যাজকগণ খ্রিস্টযাগ শুরুর আগে, খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণের আগে ও পরে এবং খ্রিস্টযাগ শেষে মোট চারবার স্যানিটাইজার ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার রাখুন;

১১. পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গির্জায় পবিত্র পানি'র পাত্র শুকনো রাখা ও স্পর্শ করা হতে বিরত থাকা;

১২. জরুরী অবস্থায় রোগীদের সাক্রামেন্ত প্রদানের উদ্দেশ্যে যাজকগণ এগিয়ে যাবেন, এ সময় যাজকগণকে সাবধানতা স্বরূপ রোগীর কাছে যাওয়ার আগে ও পরে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে; যাতে তিনি সংক্রমিত না করেন ও সংক্রমিত না হন; প্রয়োজনে গ্লাভ্‌স ব্যবহার করুন;

১৩. যদি কোন খ্রিস্টভক্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তের এই সময়ে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এসে থাকেন, তাহলে সরকারী ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলুন। যাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে (আইসোলেশনে) থাকতে বলা হয় তারা নিজের ও পরিবারের এবং দেশের জনগণের মঙ্গল চিন্তা করে তা যথাযথভাবে পালন করুন।

১৪. করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতা ও সাবধানতার পাশাপাশি এর প্রকোপ নিরসনে বিশ্বব্যাপী অনেক প্রার্থনা, সংকল্প ও সংযম প্রয়োজন। আসুন আমরা নিয়মিত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবে জীবনদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ১৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 16
❖ 10 - 16 May, 2020 , ২৭ বৈশাখ - ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

তোমার অনন্ত যাত্রার চতুর্থ বার্ষিকী স্মরণে

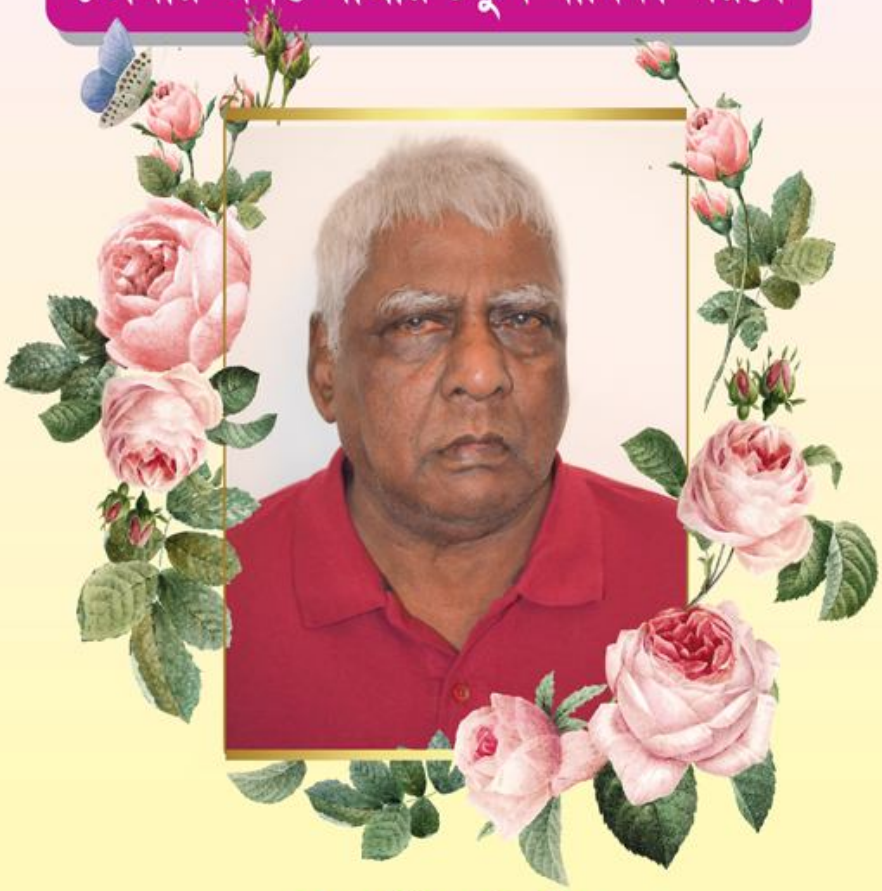

ফরু ফ্রান্সিস রোজারিও

জন্ম : ১৫ অক্টোবর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

শূন্যতা রেখে, কান্না ভুলে
বাবা আছি সুখে তোমার স্মৃতি নিয়ে।

বাবা,

তোমার শূন্যতা আজো অনুভূত হয় আমাদের সকলের মাঝে। তুমি চলে গেলেও পেছনে ফেলে গিয়েছ তোমার আদর্শ আর অফুরন্ত ভালোবাসা। তুমি পরম পিতার সেই স্বর্গীয় রাজ্য থেকে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তোমার সেই আদর্শ আর ভালোবাসায় পথ চলতে পারি। একতাবদ্ধ হয়ে জীবনে এগিয়ে যেতে পারি। পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকাহত পরিবারবর্গ
উলুখোলা, কালীগঞ্জ
গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৮/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**